যৌগিক ব্যায়াম

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীমৎস্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত
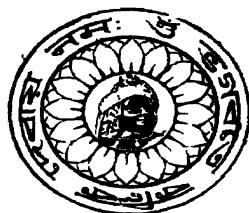
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশক—

যুগ্ম সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

২১১এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়

পোষ্ট বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া, পশ্চিম বঙ্গ

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান

১। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

৩। সর্ব্বোদয় বুক ষ্টল
হাওড়া ষ্টেশন।

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৪।১, ছিদাম মুদী লেন, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের
নিবেদন

এই পুস্তকের প্রথম ভাগ যখন ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় তখনই আমার হৃদয়ে বর্তমান ভাগ প্রকাশের প্রবল আগ্রহ ছিল ; কিন্তু শুভ কর্মে কত বিঘ্ন আসে তাহা সকলেই জানেন। তাই অনিবার্য্য কারণে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ এত কাল সম্ভবপর হয় নাই। প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। এখন যোগেশ্বর মহাদেবের অনুগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী হঠযোগী পরমহংস মাধবদাসের সুযোগ্য ও প্রধান শিষ্য স্বামী কুবলয়ানন্দ বোম্বাইতে যোগাসন ও প্রাণায়ামাদির যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন তাহা আধুনিক যোগ-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। এই সকল গবেষণা তৎসম্পাদিত "যোগ-মীমাংসা" পত্রিকায় প্রকাশিত। উক্ত ইংরাজী ত্রৈমাসিকের সতের সংখ্যা মাত্র বাহির হইবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে প্রকাশিত স্বীয় প্রবন্ধাবলী লইয়া স্বামী কুবলয়ানন্দ "আসন" ও প্রাণায়াম" নামক দুইখানি সারগর্ভ ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ করেন। বর্তমান পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার "প্রাণায়াম" শীর্ষক পুস্তক ও প্রাণায়াম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীই আমার প্রধান অবলম্বন। অনেক প্রাচীন যোগশাস্ত্র এবং আধুনিক যোগসাহিত্য মন্থনের ফলে এই পুস্তকের শুভ জন্ম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যোগশাস্ত্রের জটিলতা বাদ দিয়া যে অংশ সর্বসাধারণের উপযোগী ও সহজসাধ্য তাহাই এই পুস্তকে বিজ্ঞানালোকে ব্যাখ্যাত। শাস্ত্রবাক্য ও বৈজ্ঞানিকতার সমন্বয় সাধনই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, শাস্ত্রীয়তা সংরক্ষিত না হইলে প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না ; আবার বৈজ্ঞানিকতা প্রদর্শিত না হইলে কোন প্রাচীন বিষয়ই আধুনিক মনের উপযোগী হয় না। সেইজন্য এই পুস্তকের প্রাণায়াম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উক্তিগুলি বৈজ্ঞানিক আলোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাণায়ামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কত সুদৃঢ় তাহা এই পুস্তক পাঠে সকলে অবগত হইবেন।

স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের জন্য সর্বসাধারণ প্রাণায়ামকে কি ভাবে যোগ-সাধনের ন্যায় নির্ভয়ে নিরাপদে যৌগিক ব্যায়ামরূপে ব্যবহার করিতে পারেন তাহার বিশদ বর্ণনা ও বিধি ইহাতে প্রদত্ত। এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পাঠকপাঠিকা বুঝিতে পারিবেন, স্বাস্থ্যরক্ষা বা রোগারোগ্যের জন্য প্রাণায়ামের কতটুকু নির্বিঘ্নে অভ্যাস করা যায়। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, বর্তমান পুস্তকোক্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে প্রাণায়াম অভ্যাস আদৌ অনিষ্টকর হইবে না। যোগাসন ও প্রাণায়ামের মত স্বাস্থ্যকর, শক্তি-প্রদ ও রোগহর ব্যায়াম জগতে অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পাঠক বা পাঠিকা এই পুস্তকোক্ত কোন বিষয়ে আমার সহিত পরামর্শ করিতে চাহিলে সাক্ষাতে বা পত্রে আমি তাহা দিতে সানন্দে প্রস্তুত আছি। ত্রিশ বর্ষাধিক যোগবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে যে আলোক পাইয়াছি তৎসাহায্যেই এই পুস্তক লিখিত। প্রথম ভাগের পর দ্বিতীয় ভাগ পড়িলে যৌগিক ব্যায়াম সম্বন্ধে পাঠকপাঠিকার জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল স্নেহাস্পদ ছাত্র-বন্ধুত্রয় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি.এ. বি.টি. এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাদের অকুণ্ঠিত সহযোগিতা ব্যতীত এই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন আমার পক্ষে এই বৃদ্ধ বয়সে অন্ধপ্রায় চক্ষু লইয়া কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। শ্রুতিলিখন এবং পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে বীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ আমার প্রধান সহকারী ছিল। ইহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বাংলাদেশে প্রাণায়ামকে যৌগিক ব্যায়ামরূপে প্রচলিত করিবার জন্য এই পুস্তক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহায়ক হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। অলমিতি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বেলুড় মঠ

মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণের
নিবেদন

প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করিতে পারি নাই; কেবল প্রকাশক পরিবর্তিত হইল এবং তিনটী নূতন পরিশিষ্ট যোগ করিয়া দিলাম। সময়াভাবে ও অন্যান্য কারণে মহামুদ্রা ও সিংহমুদ্রার ছবি দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠক-পাঠিকাগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলেই আমার সর্ব শ্রম সার্থক হইবে। অলমিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়, হাওড়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৬১

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ইহা প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে কোন পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জন করি নাই। মুদ্রণ ব্যয় ও কাগজের দাম অত্যাধিক হওয়ায় মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি পূর্বের মত এই পুস্তক প্রাণায়াম বিজ্ঞান অনুশীলনে সর্ব সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে।

অলমিতি

মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৬৩

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিষয়-সূচী

যৌগিক ব্যায়াম

স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভে প্রাণায়াম

যোগবিদ্যা ভারতের মহামূল্য সম্পদ। এই বিদ্যার উদ্ভাবন ও অনুশীলন অন্য কোন দেশে এত অধিক হয় নাই বলিলেই চলে। জনৈক মার্কিণ মনীষী হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষত্ব প্রদর্শনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, পতঞ্জলির যোগদর্শনের একটি মাত্র সূত্র যদি তুলাদণ্ডের এক দিকে এবং পাশ্চাত্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিজ্ঞান অন্য দিকে রাখা যায় তাহা হইলে প্রথম দিকই বেশী ভারী হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যোগবিদ্যা বর্তমান ভারতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেইজন্য অধুনা ইহার বহুল প্রচার ও অভ্যাস আবশ্যক। যোগবিদ্যার অনুশীলন যতই বাড়িবে স্বাধীন ভারত ততই সমুন্নত হইবে।

অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গ যথাক্রমে আসন ও প্রাণায়াম। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে আসন-বিজ্ঞান বিস্তৃত ভাবে আলোচিত। বর্তমান ভাগে প্রাণায়াম-বিজ্ঞান আধুনিক গবেষণার আলোকে ব্যাখ্যাত। আসনের ন্যায় প্রাণায়ামেরও যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাহা বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ যোগবিজ্ঞানী স্বামী কুবলয়ানন্দ সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগারোগ্য করিবার যে অদ্ভূত শক্তি প্রাণায়ামের আছে তাহাই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচ্য। আসনের ন্যায় প্রাণায়ামও এক প্রকার যৌগিক ব্যায়াম। প্রাণায়ামকে breathing exercise বা নিঃশ্বাস ব্যায়ামরূপে

স্বাস্থ্যার্থিগণ কি ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন তাহা নির্দেশ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক ভীতি অনেকের মনে দৃঢ়বদ্ধ তাহা দূরীকরণার্থ আমরা দেখাইব, পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভে উহা আসনের সমকক্ষ। আসন ও প্রাণায়াম একত্র অভ্যাস করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যায়।

যে ব্যায়াম স্বাস্থ্যরক্ষণে ও রোগবিনাশে যত সমর্থ উহার মূল্যও তত অধিক। স্বাস্থ্য বলিতে আমরা কি বুঝি? মানব দেহে যে সকল যন্ত্র আছে সেগুলি সমানভাবে সক্রিয় ও সতেজ থাকিলেই পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ সম্ভব। স্নায়ুমণ্ডলী, নালীহীন গ্রন্থি, শ্বাসযন্ত্র, রক্তবাহী শিরাসমূহ এবং পরিপাক যন্ত্রাদি কর্মক্ষম থাকিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সকলের মধ্যে স্নায়ুমণ্ডলী ও নালীহীন গ্রন্থিসমূহ প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষণে উপযোগী। প্রাণায়ামে এইগুলি কিভাবে সবল ও সতেজ থাকে আমরা এখানে তাহাই আলোচনা করিব। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুমণ্ডলী প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ পরিপাক, রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি স্নায়ুজালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্নায়ুমণ্ডলীর মূলকেন্দ্র মস্তিষ্কে এবং শাখাকেন্দ্রগুলি মেরুদণ্ডে অবস্থিত। বৈদ্যুতিকশক্তিকেন্দ্র হইতে যেমন বহু তার দিয়া নানা স্থলে বিদ্যুৎ প্রেরিত হয় তেমনি মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলি হইতে দেহের সর্বত্র আদেশ বাহিত হয়। স্নায়ুকেন্দ্র বা কোন একটি স্নায়ু দুর্বল বা অচল হইলে স্থানীয় অঙ্গ নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়; এমন কি, ইহার ফলে জীবন-প্রদীপও নির্বাপিত হইতে পারে। পক্ষাঘাত, উন্মাদ রোগ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফলে উৎপন্ন হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলেও বা তারসমূহ আবশ্যকীয় বিদ্যুৎ যথাস্থানে বহন করিলেও যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রাচুর্য্যাভাব ঘটে তাহা হইলে কারখানার যন্ত্রগুলি অচল হইয়া পড়ে। দেহযন্ত্রের শক্তিও নালীহীন গ্রন্থিসমূহ হইতে নিঃসৃত রসের উপর নির্ভরশীল। সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী স্বাস্থ্যবান্ থাকিলেও যদি এই গ্রন্থিসমূহ প্রয়োজনীয় রস নিঃসরণ করিতে অক্ষম হয় তাহাহইলে স্নায়ুজাল দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ থাইরয়েড গ্রন্থির কথাই ধরা যাক্। ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক বিদিত নালীহীন গ্রন্থি। স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির দেহ হইতে থাইরয়েড তুলিয়া লইলে দেখা গিয়াছে, তাহার চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হয়, গণ্ডদ্বয় বসিয়া যায়, পেশীসমূহ স্থূল বা ক্ষীণ হয়, চুল পাকিতে আরম্ভ করে এবং অকাল বার্ধক্য উপস্থিত হয়। থাইরয়েড যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত হইলে তাহার দেহে আবার যৌবনোচিত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে, জরার চিহ্ন অন্তর্হিত হয়, মানুষটি সোজা হইয়া চলে এবং তাহার জীবন আর দুর্বহ বোধ হয় না।

সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষণে স্নায়ুমণ্ডলীর ন্যায় নালীহীন গ্রন্থিবর্গের প্রভাব সমধিক; কিন্তু উভয়েই রক্তবাহী শিরা, শ্বাসযন্ত্র ও পরিপাকযন্ত্রের উপর সর্ব বিষয়ে নির্ভর করে। বিশুদ্ধ বায়ু ও বিশুদ্ধ রক্ত ব্যতীত স্নায়ুমণ্ডলী বা নালীহীন গ্রন্থিরাজী সুস্থ থাকিতে পারে না। রক্তে রোগবিষ (toxin) জমিলে রক্তপ্রবাহ ভালভাবে হয় না। রক্ত বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্র সবল থাকাপ্রয়োজন। পরিপাকযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র সহায়ে যথাক্রমে অক্সিজেন (অম্লজান) ও পুষ্টি রক্তে প্রেরিত হয়। শ্বাসযন্ত্র সবল না থাকলে আবশ্যকীয় অক্সিজেন ফুস্ফুসে প্রবেশ করিতে পারে না। যতই আমরা পুষ্টিকর

আহার্য্য খাই না কেন, পরিপাকযন্ত্র সবল না থাকিলে উহার সারভাগ রক্তে সঞ্চিত হয় না। শ্বাসক্রিয়া দোষদুষ্ট হইলে রক্তে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মিশ্রিত হয় না এবং রক্তাভাবে তন্তুসমূহ (tissues) দুর্বল হইয়া পড়ে। শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্র সবল না থাকিলে রক্ত অপরিষ্কার এবং রোগবিষের আকর হয়। কার্বনিক এসিড (অঙ্গারাম্ল) দেহে সর্বদা উৎপন্ন হইতেছে। রক্তবাহী যন্ত্র ইহাকে ফুস্‌ফুসে টানিয়া আনে এবং তথা হইতে উহা বাহিরে নির্গত হয়। যদি ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় এই বিষাক্ত বায়ু দেহ হইতে বিতাড়িত করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে ইহা বিভিন্ন তন্তুতে জমিয়া রোগবীজাণু সৃষ্টি করে। আবার ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশই অসার পদার্থ। মলমূত্ররূপে সেই অসার পদার্থ নিঃসারক যন্ত্রসমূহ দ্বারা দেহ হইতে অপসারিত হয় ; কিন্তু নিঃসারক যন্ত্রসমূহ সবল না থাকিলে অসার পদার্থ মলভাণ্ড ও ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতি স্থানে জমিয়া রোগ সৃষ্টি এবং রক্ত অপরিষ্কার করে।

মূত্রাশয়ও একটী নিঃসারক যন্ত্র। ইহার দ্বারা মুত্র ও তৎসহিত অনেক বিষাক্ত পদার্থ দেহ হইতে বহির্গত হয়। সেইগুলি নির্গত না হইলে দেহের সন্ধিস্থলসমূহে জমিয়া বাতাদি রোগ সৃষ্টি করে। রক্ত বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে মূত্রাশয়াদি যন্ত্র সবল ও সুস্থ থাকা দরকার। মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে রক্ত অপরিষ্কার হয় ও চর্মরোগাদি জন্মে।

মূত্রাশয় ও মলভাণ্ড তলপেটে এবং ফুস্‌ফুস্‌ বুকে অবস্থিত। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার সহিত ডায়াফ্রামের (diaphragm) যে উত্থান ও পতন হয় বা তলপেটের পেশীসমূহের যে সংকোচন ও সম্প্রসারণ হয় তাহার দ্বারা মুত্রাশয় ও কোষ্ঠাদি মৃদু মর্দন ও অবিরাম দোলন পায়। প্রাণায়ামের সময় যখন বায়ু রেচক, পূরক বা কুম্ভক করিতে

হয় তখন উক্ত মর্দন ও দোলন বহু গুণে বাড়িয়া যায়। কোথাও রক্তপ্রবাহের বদ্ধতা (congestion) থাকিলে তাহা উক্ত চাপের ফলে বিদূরিত হয়। মূত্রাশয় ও কোষ্ঠাদি যে সকল স্নায়ু পেশীর দ্বারা চালিত সেইগুলিও প্রাণায়াম অভ্যাসে পরিপুষ্ট হয়। প্রাণায়ামকালে মূত্রাশয় ও কোষ্ঠাদি যে শক্তি পায় তাহা দিবসের অবশিষ্ট সময়েও কার্য্যকরী থাকে। স্নায়ুসমূহ ও পেশীগুলি একবার সতেজ হইলে অনেক ক্ষণ সেই সতেজ ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

ফুস্‌ফুসের সম্বন্ধে একই কথা খাটে। ফুস্‌ফুসের নমনীয়তা এবং উহার পেশীসমূহেব সবলতার উপর স্বাস্থ্যপ্রদ শ্বাসক্রিয়া নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে ফুস্‌ফুসদ্বয় এবং উহার পেশীসমূহের ব্যায়াম বিধান প্রাণায়ামের সর্বপ্রধান কার্য্য। ফুস্‌ফুসের মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ সাধারণ নিঃশ্বাসে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ অব্যবহৃত থাকে। এই অব্যবহৃত অংশে বীজাণু জমিয়া বা জাত হইয়া যক্ষ্মা, হাঁপানী প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি উৎপন্ন করে। ফুস্‌ফুস্ এবং বক্ষঃস্থল নিত্য বহুবার সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হইলে অসাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভ হয়। খাদ্য ও পানীয় পরিপাক এবং উহাদের সারাংশ গ্রহণ করিতে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহারাও প্রাণায়ামে প্রচুর ব্যায়াম লাভ করে। যাহারা অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে আক্রান্ত তাহাদের যকৃৎ স্বভাবতঃ দুর্বল ও নিস্তেজ থাকে। যকৃতের এই দুর্বলতা দূর করিতে প্রাণায়াম একটি উত্তম ব্যায়াম। স্বামী কুবলয়ানন্দের নির্দেশে বহু রোগী প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা পুরাতন অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। দেহের রক্তপ্রবাহে প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ করিলে অচিরে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা

প্রভৃতি রোগে অক্সিজেন চিকিৎসা আজকাল প্রচলিত হইয়াছে। রক্তে যতই অক্সিজেন (অম্লজান) বায়ু মিশ্রিত হয় ততই রক্ত বিশুদ্ধ ও রোগবিষমুক্ত হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য এবং শক্তি লাভে ও সংরক্ষণে অম্লজান বায়ু গ্রহণ সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ প্রাণায়ামে যতটা বাড়ে ততটা অন্য কোন প্রকার ব্যায়ামে সম্ভব হয় না। ইহার কারণ এই নহে যে প্রাণায়াম-কালে ফুস্‌ফুসে প্রচুর অক্সিজেন গৃহীত হয়; কিন্তু প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসযন্ত্র এমন অভ্যস্ত ও বিস্তৃত হয় যে, চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া ইহা প্রচুর অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। প্রাণায়ামের সময় অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে গৃহীত হয়—এই ধারনা যে কুসংস্কার-প্রসূত তাহা দেখাইতেছি। মনে করুন, যে কোন প্রকার একটি প্রাণায়াম করিতে এক মিনিট সময় লাগে। সাধারণ ব্যক্তি এক মিনিটে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসে প্রায় ৭০০০ সি সি. বায়ু গ্রহণ করে। একই ব্যক্তি প্রাণায়ামকালে এক মিনিটে খুব বেশী ৩৭০০ সি. সি. বায়ু লইতে পারে। প্রাণায়ামে মোট বায়ু গ্রহণ অনেক কম হওয়ায় রক্তে অক্সিজেন সংমিশ্রণ সেই পরিমাণে কম হয়। স্বামী কুবলয়ানন্দ বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বায়ু কুম্ভক দ্বারা রক্তে অক্সিজেন মিশ্রণ বৃদ্ধি হয় না। আধ মিনিট পর্য্যন্ত বায়ু নিরোধ করিলেও অক্সিজেন মিশ্রণের মাত্রা বেশী বাড়ে না। তবে প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস-যন্ত্র এমন ভাবে সম্প্রসারিত ও সুশিক্ষিত হয় যে, দিবারাত্রির সর্বক্ষণ অধিকতর অক্সিজেন গ্রহণপূর্বক উহা রক্তকে সতেজ ও বিশুদ্ধ করে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রাণায়াম ফুস্‌ফুসের উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

*উজ্জায়ী প্রাণায়াম মিনিটে চার বার অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে।

যাহারা কেবল মাত্র রেচক ও পূরক করিবেন তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য। স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের জন্য ইহাই যথেষ্ট। মিনিটে চার বার উজ্জায়ী করিলে প্রাণায়ামকালে যে পরিমান অক্সিজেন গৃহীত হয় তাহা সাধারণ শ্বাসক্রিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী।

শারীর তত্ত্বের আলোকে প্রাণায়াম আলোচনা করিলে উহার বিশেষত্ব সহজে বোঝা যায়। স্বামী কুবলয়ানন্দ বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অপসারণে প্রাণায়ামের তুল্য অন্য কোন ব্যায়াম সমর্থ নহে। তিনি এই সম্বন্ধে যে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন তন্মধ্যে আটটির বর্ণনা যোগ-মীমাংসা পত্রিকায় (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যায়) প্রকাশিত। প্রাণায়াম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই পাঁচটি প্রধান প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক।—(ক) নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ শ্বাসক্রিয়া অপেক্ষা অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয় কি না? (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণার্থ প্রাণায়মের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক কালমাত্রা কি? (গ) অধিক মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে অধিকতর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সইড অপসারিত হয় কি না? (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণে কুম্ভকের বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? (ঙ) কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে প্রাণায়াম হইতে কুম্ভক বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয় কি না? এই পঞ্চ প্রশ্নের সম্যক্ সমাধান করিতে হইলে বহু পরীক্ষা আবশ্যক। প্রথম দুইটি প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ উপরোক্ত আটটি পরীক্ষায় পাওয়া যায়।

পাঁচটি স্বাস্থ্যবান্ যুবকের উপর এই আটটি পরীক্ষা করা হয়। ১৪, ২১, ২৮, ৩৫, এবং ৪৯ সেকেণ্ড যথাক্রমে সকলে কুম্ভক করিলেন।

১৪ সেকেণ্ড কুম্ভকের ফলে দেখা গেল, একশত ভাগ পরিত্যক্ত বায়ুর মধ্যে মাত্র ৩.৯৭ ভাগ কার্বণ ডাই-অক্সাইড অপসারিত হয়। পরিত্যক্ত বায়ুর পরিমাণ ২৮০০ সি. সি. হইলে অপসারিত কার্বণ ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ১১১.১৬ সি. সি. হয়। ২১ সেকেণ্ড কুম্ভকের ফলে উল্লিখিত পরীক্ষায় দেখা গেল, ১২৭.৬৮ সি, সি, কার্বণ ডাই অক্সাইড অপসারিত হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে কুম্ভকের মাত্রা অধিক হইলে কার্বণ ডাই-অক্সাইডের অপসারণ অধিক হয় না। তৃতীয় ও চতুর্থ পরীক্ষায় কালমাত্রা সমান ছিল। তৃতীয় পরীক্ষায় ৭ সেকেণ্ড কুম্ভক ও ১৪ সেকেণ্ড রেচক ছিল; কিন্তু চতুর্থ পরীক্ষায় কুম্ভক ছিল না; ২১ সেকেণ্ড রেচক এবং ৭ সেকেণ্ড পূরক ছিল। তৃতীয় পরীক্ষা কুম্ভক-সহিত এবং চতুর্থ পরীক্ষা কুম্ভক-রহিত। উভয়ের পার্থক্য এই যে, কুম্ভক-সহিত প্রাণায়ামে কুম্ভক-রহিত প্রাণায়াম অপেক্ষা সামান্য অধিক পরিমাণে কার্বণ ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরীক্ষা দ্বারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে প্রাণায়াম কুম্ভক-বর্জিত হওয়া আবশ্যক। নিঃশ্বাস ব্যায়ামরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে কুম্ভক নিষ্প্রয়োজন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাণায়ামের সময় ফুস্‌ফুসে, বায়ুর চাপ কিরূপ বাড়ে বা কমে সেই বিষয় আমরা এখন আলোচনা করিব। স্বামী কুবলয়ানন্দ তাহার যৌগিক গবেষণাগারে পাঁচ ব্যক্তিকে লইয়া দ্বাদশটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পাঁচ জনই সবল ও স্বাস্থ্যবান যুবক এবং তাহাদের বয়স বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ছিল। খালি পেটে তাহাদিগকে সকালে পরীক্ষা করা হয়। এই সকল পরীক্ষার বিস্তৃত

বিবরণ 'যোগ মীমাংসা' ত্রৈমাসিকে (৪র্থখণ্ড, ১ম সংখ্যায়)প্রকাশিত। পাশ্চাত্যে গভীর নিঃশ্বাস সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহার ফল অপেক্ষা উল্লিখিত গবেষণার ফল আরও সন্তোষ জনক ও শিক্ষাপ্রদ। শারীর-তত্ত্ব অনুসারেও সাধারণ শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা ফুস্‌ফুসে, থোরাক্সে (thorax), তলপেটে এবং ইসোফেগাসে (oesophagus) বায়ু-চাপ পরিবর্ত্তিত হয়। এই চারিটি যন্ত্রে বায়ুচাপের পরিবর্তন উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে শারীর তত্ত্বের আলোকে ইহাদের সংস্থান প্রথমে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

পাঁজরার (ribs) নীচে এবং ডায়াফ্রামের (diaphragm) এর উপরে বক্ষঃস্থল (thorax) অবস্থিত । এই কক্ষে বায়ু প্রবেশের দ্বার নাই। নমনীয় এবং নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত যথাক্রমে প্রতি মিনিটে কয়েকবার সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। বাহিরের ব্যয়ু-মণ্ডলের সহিত ইহার কোন সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। থোরাক্সের মধ্যে যে দুইটি বায়ুর থলী বিদ্যমান এবং পর্দা (olurae) দ্বারা সমাবৃত তাহাদিগকে ফুস্‌ফুস বলে। বাহিরের বায়ুমণ্ডলের সহিত ফুস্‌ফুস্ বায়ুনালী দ্বারা সংযুক্ত। এতদ্ব্যতীত থোরাক্সে হৃৎপিণ্ড, হৃদ্ধমনী (aorta), নিম্ন ও উচ্চ মহাশিরা (vane cavae) এবং ইসোফেগাস অবস্থিত। ফুস্‌ফুসের মধ্যে গৃহীত বায়ুর দ্বারা উহার অভ্যন্তরে যে চাপ পড়ে তাহার পরিবর্ত্তনও আমাদের আলোচ্য বিষয়। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে পঞ্জরের উত্থান এবং ডায়াফ্রামের অবতরণ ও সঙ্কোচন দ্বারা থোরাক্স সম্প্রসারিত হয়। ইহাতে থোরাক্স ও ফুসফুস উভয়ের সামর্থ্য বর্ধিত হয়। ফুসফুসের সামর্থ্য বৃদ্ধি দ্বারা তন্মধ্যস্থ বায়ু লঘু-কৃত (rarefied) হইয়া যায় এবং তাহার ফলে উহার আভ্যন্তরীণ

চাপ কমে। থোরাক্স সম্প্রসারিত হইবার পূর্বে ফুস্‌কুসের মধ্যবর্তী বায়ু এবং বহির্দেশস্থ বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান থাকে। থোরাক্সের সম্প্রসারণ বন্ধ হইলে ফুস্‌ফুসের মধ্যবর্তী ও বহির্দেশস্থ বায়ুর চাপ সমান হইয়া যায় এবং বায়ুর গতি বন্ধ হয়। তৎপরে যে ক্ষণিক বিরতি আসে তাহাতে ফুস্‌ফুসের মধ্যবর্তী বায়ু এবংবহির্দেশস্থ বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান থাকে। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ বায়ু-চাপ বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা কম হয় এবং প্রশ্বাস ত্যাগ কালে উক্ত চাপ বাহিবের বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা অনেক বেশী হয় ; কিন্তু প্রশ্বাসের পরে যে ক্ষণিক বিরতি হয় তাহাতে নিঃশ্বাসের পরবর্তী বিরতির ন্যায় উভয় চাপ সমান থাকে। ফুসফুস-দ্বয়ের যতটুকু সামর্থ্য তদপেক্ষা অধিক এক সি. সি. বায়ুও ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া গভীর নিঃশ্বাসের সময়ইহাদের আভ্যন্তরীণ বায়ুচাপ বৃদ্ধি হয় না। কেবল দ্রুত শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করিলেই উক্ত চাপ পরিবর্তিত হয়। আভ্যন্তর শ্বাসনালীর দ্বার (glottis) আংশিক ভাবে রুদ্ধ বা সংকীর্ণ করিলে উক্ত পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

গভীরতম প্রশ্বাসের পরে শ্বাস-যন্ত্র নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্যব্যস্তহইয়া উঠে ; কিন্তু নাসিকা বন্ধ রাখায় কপট নিঃশ্বাস এবং তদঙ্গীভূত শ্বাসযন্ত্রের পেশীসমূহের শূন্যগতি চলিতে থাকে। অবশ্য উহাতে বায়ু গ্রহণ সম্ভব হয় না। উক্ত প্রকার শূন্য নিঃশ্বাসে ফুস্‌ফুসের সামর্থ্য বর্ধিত হয় এবং তন্মধ্যস্থ বায়ুর পরিমাণ সমান থাকায় আভ্যন্তরীণ চাপ অনেক কমিয়া যায়। তখন শ্বাসগতি স্বাভাবিক থাকিলেও চাপের হ্রাস লক্ষিত হয়। গভীরতম নিঃশ্বাসের প্রচেষ্টা ফুসফুসে সমধিক শূন্য চাপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। স্বামী কুবলয়ানন্দ

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত শূন্য (negative) চাপ ৯০ মিলিমিটার (m. m.) পর্য্যন্ত বাড়ে। যোগশাস্ত্রের ভাষায় গভীরতম প্রশ্বাসের পরে যে গভীরতম বায়ুশূন্য নিঃশ্বাস চলে তাহাকে উড্ডীয়ান বলে। ইহাতে ফুস্‌ফুসে আভ্যন্তরীণ চাপ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য শারীর তত্ত্ববিৎগণ পরীক্ষা দ্বারা থোরাক্সের মধ্যবর্তী বায়ুর চাপ নির্ধারণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পারা (mercury) উক্ত চাপে ৩০ হইতে ৮০ মিলিমিটার পর্য্যন্ত নামে। স্বামী কুবলয়ানন্দের পরীক্ষার ফল আরও আশ্চর্য্যজনক। তাহার মতে উড্ডীয়ানের সময় ফুসফুস, থোরাক্স ও ইসোফেগাসে বায়ুচাপ খুব কমিয়া যায়। উড্ডীয়ানে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া উহাকে প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফুসফুসের বহির্দেশস্থ প্লুরা প্রভৃতি স্থানে যে বায়ুচাপ পড়ে তাহাই থোরাক্সের আভ্যন্তরীণ চাপরূপে স্বীকৃত। থোরাক্সের সহিত বায়ুমণ্ডলের সংযোগ ফুস্‌ফুসের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলের চাপ ফুস্‌ফুসের উপর পড়ে এবং ফুস্‌ফুস প্লুরা ও থোরাক্স প্রভৃতির উপর চাপ দেয়। ফুস্‌ফুস্‌ বায়ুমণ্ডল ও থোরাক্সের মধ্যবর্তী বলিয়া বায়ুমণ্ডলের সমগ্র চাপ থোরাক্সের উপর পড়ে না। ফুস্‌ফুস বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ চাপ সংকোচন দ্বারা কমাইয়া দেয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ফুস্‌ফুসদ্বয় সর্বক্ষণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রসারিত থাকে; এমন কি, গভীরতম প্রশ্বাসের পরেও স্বাভাবিক আকারে সঙ্কুচিত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিৎগণ ফুসফুসের এই নমনীয় সঙ্কোচনের চাপ পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছেন। সাধারণ নিঃশ্বাসের পরে সেই চাপ ৭·৫ এম. এম. এবং সাধারণ প্রশ্বাসের পরে উহা ৪·৫

এম. এম. হয় ; কিন্তু গভীরতম নিঃশ্বাসে ইহা ৩০ এম. এম পর্য্যন্ত উঠে। যদি ফুস্‌ফুসের সাধারণ চাপ পারার ৭৬০ এম. এম. হয় (ইহাই বায়ু মণ্ডলের সাধারণ চাপ) তাহা হইলে থোরাক্সের মধ্যবর্তী চাপ হয় ৭৬০—৪.৫ = ৭৫৫.৫ এম এম. সাধারণ প্রশ্বাসের শেষে। সাধারণ নিঃশ্বাসের উক্ত চাপ হইবে ৭৬০—৭.৫ = ৭৫২.৫ এম. এম. এবং গভীর নিঃশ্বাসের শেষে উহা হইবে ৭৬০—৩০ = ৭৩০ মিলিমিটার।

বহু পরীক্ষার দ্বারা স্বামী কুবলয়ানন্দ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, থোরাক্সের বায়ুচাপ দ্বারা ইসোফেগাস ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত হয়। থোরাক্সের আভ্যন্তরীণ চাপ যে পরিমাণে কমে ইসোফেগাসের আভ্যন্তরীণ চাপ সেই পরিমাণে কমে। আর থোরাক্সের আভ্যন্তরীণ চাপ যত বাড়ে ইসোফেগাসের আভ্যন্তরীণ চাপ তত বাড়ে। সুতরাং ফুস্‌ফুস্, থোরাক্স ও ইসোফেগাস—এই তিন যন্ত্রের মধ্যে একটির বায়ু চাপ জানা থাকিলে অন্য দুইটির বায়ুচাপ সহজে স্থির করা যায়। এই চাপত্রয় শিরাস্থিত রক্তের প্রবাহকে অতিশয় প্রভাবিত করে। ইহা ভালরূপে বুঝিতে হইলে তলপেটের আভ্যন্তরীণ চাপ সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় আবশ্যক। থোরাক্সের ন্যায় তলপেটও বায়ুমণ্ডলের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংযুক্ত নহে। সাধারণতঃ ইহার আভ্যন্তরীণ চাপ শূন্য (negative) নহে। তলপেটের সংকোচন বা ডায়াফ্রামের অবতরণ দ্বারা তলপেটের চাপ বাড়ে; কিন্তু উভয় অবস্থা যুগপৎ উপস্থিত হইলে উহার চাপবৃদ্ধি সমধিক হয়। সম্ভবতঃ কেবল মাত্র উড্ডীয়ান ও নৌলীর দ্বারা তলপেটের আভ্যন্তরীণ চাপ শূন্য (negative) হইয়া থাকে।

থোরাক্স ও তলপেটের সাধারণ অবস্থায় যথাক্রমে উহা উচ্চ ও নিম্ন চাপে থাকে। মহাশিরার নিম্নাংশ তলপেটে এবং উর্ধাংশ থোরাক্সে অবস্থিত। সুতরাং উহার নিম্নাংশের চাপ উর্ধাংশের চাপ অপেক্ষা উচ্চতর। ইহার ফলে থোরক্সের অন্তর্বর্তী হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্তপ্রবাহ চালিত হয়। থোরাক্সের শূন্য চাপে হৃৎপিণ্ড থোরাক্সের বহির্দেশস্থ সমস্ত অংশ হইতে সকল শিরাবাহী রক্ত টানিতে পারে। নিঃশ্বাস যতই গভীর হয় ততই শিরাবাহী রক্তের হৃৎপিণ্ডমুখী গতির অনুকুল অবস্থা আসে। যদি গভীরতম নিঃশ্বাসের পরে তলপেটস্থ পেশীগুলি সজোরে সঙ্কুচিত হয় তখন শিরাবাহী রক্তকে টানিয়া লইবার পক্ষে হৃৎপিণ্ডে বায়ুচাপের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অনুকূল হয়। এইরূপে গভীরতম প্রশ্বাসের পরেও থোরাক্সের মধ্যবর্তী ও বহির্দেশস্থ চাপদ্বয়ের পার্থক্য এত বেশী থাকে যে, হৃৎপিণ্ড নিঃশ্বাসকালের ন্যায় অনুকূল অবস্থা লাভ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুক প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, ফুস্‌ফুসের বায়ুচাপ সর্বদা থোরাক্সের বায়ুচাপ অপেক্ষা উচ্চতর এবং গভীর নিঃশ্বাসে উভয় বায়ুচাপের পার্থক্য বাড়ে। আবার গভীর নিঃশ্বাসে উক্ত পার্থক্য কমে। সেইজন্য গভীর নিঃশ্বাসকালে হৃৎপিণ্ড রক্ত আকর্ষণার্থ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা পায়। মহাশিরার দুই অংশ সমগ্র শরীর হইতে শিরাবাহী রক্ত টানিয়া দক্ষিণ অলিন্দে (auricle) ঢালিয়া দেয়। এই অলিন্দ রক্ত গ্রহণার্থ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৮/১০ সেকেণ্ড শিথিল থাকে এবং বাকী ১ সেকেণ্ডে হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া শিরাবাহী রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে (ventricle) ঢালিয়া দেয়। দক্ষিণ নিলয় হইতে সঙ্কোচন দ্বারা রক্ত ফুস্‌ফুসে বাহিত হয়। বাম

অলিন্দও এইরূপে বাম নিলয়ে রক্ত ঢালিয়ে দেয়। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে দক্ষিণ অলিন্দ স্বভাবতঃ বহির্দেশস্থ শূন্য চাপে প্রসারিত হয়। এই জন্যই ইহা এত অধিক পরিমাণে রক্ত আকর্ষণ করিয়া ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করে। গভীর নিঃশ্বাসে ধমনীগুলি (arteries) প্রসারিত না হইলেও প্রচুর রক্ত সরবরাহ পায়। প্রাণায়ামে গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণকালে এই অবস্থা আরও অনুকূল হয়।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যে নিঃশ্বাস ব্যায়াম আবিষ্কার করিয়াছেন তৎদ্বারা হৃৎপিণ্ড মৃদু মর্দন পায়; কিন্তু প্রাণায়ামে হৃৎপিণ্ড যে অনুকূল অবস্থা লাভ করে তাহা দ্বারা রক্ত সঞ্চালন আরও উত্তমরূপে হয়। ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামের যে অংশ কপালভাতির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত তদ্বারা দেহে অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক কম্পন সৃষ্ট হয়। উক্ত কম্পন মানব শরীরে প্রায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ধমনীসমূহে, শিরাসকলে, কৈশিকগুলিতে এবং প্রত্যেক তন্তুতে বিস্তৃত হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা সমগ্র রক্তবাহী যন্ত্র উত্তম ব্যায়াম ও মর্দন লাভ করে রক্তের বিশুদ্ধতা ও প্রবাহ প্রয়োজন অনুসারে হইলে বায়ুমণ্ডলী ও নালীহীন গ্রন্থিসমূহের স্বাস্থ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামে রক্তপ্রবাহের বেগ দ্রুত হয় এবং রক্তের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। মস্তিক, মেরুদণ্ড প্রভৃতিও এই ভাবে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিসম্পন্ন হয়। প্রাণায়ামে স্নায়ুমণ্ডলী যে শুধু প্রচুর রক্ত সরবরাহ পায় তাহা নহে; ইহার দ্বারা সকল স্নায়ু সাক্ষাৎভাবে ব্যায়াম প্রাপ্ত হয়। পূরকের সময় ডায়াফ্রাম সঙ্কুচিত হইয়া নামিয়া আসে এবং তলপেটস্থ পেশীগুলি সামান্য সঙ্কুচিত থাকে। তলপেট ও ডায়াফ্রামের মিলিত ক্রিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নাংশকে উর্দ্ধদিকে টানিয়া তোলে। জালন্ধর বন্ধ

অভ্যাসকালে মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশও উর্দ্ধ দিকে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে মেরুদণ্ড যে ব্যায়াম লাভ করে তাহার দ্বারা মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি সবল ও সুপুষ্ট হয়। মেরুদণ্ডের ন্যায় মস্তিষ্কও প্রাণায়ামে প্রচুর ব্যায়াম প্রাপ্ত হয়। উজ্জায়ী বা ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম প্রত্যেক বার অভ্যাস দ্বারা সমগ্র দেহযন্ত্র অধিকতর স্বাস্থ্যবান হয়। প্রাচীন ভারতের যোগীঋষিগণের মতে প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ-ক্রিয়া অধিক-তর স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে পারে। স্বামী কুবলয়ানন্দ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভে প্রাণায়াম যতখানি সমর্থ অন্য কোন ব্যায়াম উহার এক শতাংশও সমর্থ নহে।

শারীর বিজ্ঞান মতে নালীহীন গ্রন্থিগুলির স্বাস্থ্যরক্ষার দ্বারা মানবের দেহমন উন্নত করা যায়; কিন্তু আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাসে যে অলৌকিক শক্তি ও স্বাস্থ্য স্নায়ুকেন্দ্রগুলি ও নালীহীন গ্রন্থিসমূহ লাভ করে তাহা অন্য কোন ব্যায়ামে সম্ভব নহে। প্রাণায়ামের দ্বারা মেরুদণ্ডে যে উর্দ্ধমুখী টান (pull) সৃষ্টি হয় তাহা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মেরুদণ্ডের মূলদেশ হইতে উচ্চতম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বাংশ প্রাণায়ামে যে ব্যায়াম প্রাপ্ত হয় তাহার ফলে দেহের সকল স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত ও সঞ্জীবিত হয়। মূলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ প্রাণায়ামের সহিত অভ্যাস করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়। ইহার দ্বারা দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত এবং ইন্দ্রিয়গুলি এমন সূক্ষ্ম ও সতেজ হয় যে, দূরশ্রবণ ও দূরদর্শনাদি আনায়াসে করিতে পারা যায়।

খাদ্য, পানীয় এবং বায়ুই দেহের প্রধান আহার। এই

আহারত্রয়ের মধ্যে বায়ুর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। খাদ্যগ্রহণ না করিয়া মানুষ তিন সপ্তাহ বাঁচিতে পারে, পানীয় ব্যতীত তিন দিবস বাঁচা সম্ভব; কিন্তু বায়ু ব্যতীত মানুষ তিন মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য বায়ুকে দেহের প্রাণ বলে। বায়ুর দ্বারাই রক্ত সঞ্চালন, মলমূত্র ত্যাগ, খাদ্য-পানীয় গলাধঃকরণ ও পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া সম্ভব হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন বায়ু গৃহীত এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু উদ্ভিদ্‌সমুহ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এইজন্য যোগিগণ বলেন, উদ্যানে ও অরণ্যে বা বৃক্ষতলে নিবাস স্বাস্থ্যকর। মুনিঋষিগণ এই কারণেই পর্বতে, বনে ও জঙ্গলে আশ্রম নির্মাণপূর্বক নিবাস করিতেন। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারা জীবন ধারণ সম্ভব। গোরখপুরের বিখ্যাত যোগী পওহারী বাবা কেবল বায়ু গ্রহণপূর্বক কিছু কাল জীবিত ছিলেন। রাজা রণজীৎ সিংহের নির্দেশে সাধু হরিদাসকে চল্লিশ দিন কাঠের বাক্সমধ্যে পুরিয়া ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখা হয়। ইহার পর মহাযোগী হরিদাসকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রাণায়ামে চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

সুন্দরবনের জঙ্গলে বল্মীকস্তূপের মধ্যে দুইটি ধ্যানমগ্ন মহাযোগীকে পাওয়া যায়। খিদিরপুরের কোন জমিদার তাঁহাদিগকে স্তূপের মধ্য হইতে সযত্নে বাহির করিয়া আনেন। তন্মধ্যে একজনের ধ্যান তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হওয়ায় দ্রুতবেগে তিনি অদৃশ্য হন। অন্য জনকে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আনিয়া নানা উপায়ে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা হয়। দীর্ঘ কাল তাঁহারা এইভাবে জড় সমাধিতে মগ্ন

ছিলেন। নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা ফুসফুসের বায়ুগ্রহণ শক্তি বাড়াইলে উক্ত উপায়ে যে কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। ইহা পরীক্ষিত সত্য। জন্তুতত্ত্ববিৎগণ বলেন, ভেক, সর্প ও অন্য কোন কোন জন্তু বৎসরের কয়েক মাস ভূগর্ভে বাস কালে বায়ুর দ্বারাই প্রাণরক্ষা করে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে অক্সিজেন সেবন করাইলে কিছুক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। অক্সিজেন যতই গৃহীত হয় ততই শরীরসুস্থ ও সবল থাকে। বায়ুমণ্ডলের এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। সমুদ্র ও নদীর জলের ৮/৯ অংশ অক্সিজেন। উদ্ভিদ্‌জগৎ এবং পর্বতাদির অর্ধেকের অধিক ভাগ অক্সিজেনে পরিপূর্ণ।

সাধারণতঃ আমাদের নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাস এত অনিয়মিত যে, ইহাতে ফুস্‌ফুসের পূর্ণ ক্রিয়া হয় না। এইজন্য আমাদের ফুস্‌ফুসের নিয়মিত ব্যায়াম আবশ্যক। প্রাণায়ামের দ্বারা ফুসফুসের অব্যবহৃত অংশ সক্রিয় করিতে পারিলে অসাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। যোগাসন ব্যতীত ফুস্‌ফুসের পৃথক্ ব্যায়াম আবশ্যক। আসনের সঙ্গে প্রাণায়াম নিত্য অভ্যাস করা উচিত। প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে সর্দি, কাশি, হাঁপানি প্রভৃতি ব্যাধি ক্রমশঃ সারিয়া যায়। বোম্বাইএর কোন ডাক্তার নিজের পুরাতন হাঁপানি প্রাণায়ামের দ্বারাই আরোগ্য করিতে সমর্থ হন। অধিকন্তু তৎপূর্বে তিনি বিভিন্ন ঔষধ সেবন এবং ইনজেক্‌সন গ্রহণ দ্বারাও তাহা সারা-ইতে পারেন নাই। আমি নিজেও প্রাণায়ামের দ্বারা স্বীয় হাঁপানি সারাইয়া ছিলাম। স্বামী কুবলয়ানন্দ বলেন, প্রাণায়াম দুর্বল হৃৎপিণ্ড ও দুর্বল ফুসফুসের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যায়াম। কোন ষোড়শবর্ষীয় বালকের বুকে হাত দিয়া একদিন দেখিলাম, তাহার একটি ফুসফুস

ধড়ফড় করিতেছে কিন্তু অন্যটীতে কোন সাড়া নাই। বালকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তৎপুত্রের সাড়াহীন ফুস্‌ফুসটি জন্মাবধি নিষ্ক্রিয়। আমার পরামর্শে কয়েক সপ্তাহ আসন ও নিঃশ্বাস ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে বালকের নিষ্ক্রিয় ফুসফুস কিঞ্চিৎ সক্রিয় হইয়াছিল এবং উহাতে স্পন্দন আসিয়াছিল। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শে এবং অতিশয় সাবধানে প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিধেয়।

মানুষ যখন কাম বা ক্রোধাদির বশীভূত হয় তখন তাহার নিঃশ্বাস ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত হয়; কিন্তু চিত্ত সুশান্ত ও সংযত থাকিলে নিশ্বাস সুদীর্ঘ, গভীর ও নিয়মিত হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা নিঃশ্বাস গভীর করিতে পারিলে মানুষ কাম বা ক্রোধের বেগ সহজে ধারণ করিতে পারে। আমরা ফুস্‌ফুসের অল্পাংশ ব্যবহার করি বলিয়া আমাদের প্রশ্বাস নিঃশ্বাস অপেক্ষা দীর্ঘতর। ইহাতে আয়ুক্ষয় হয়। ক্রমে ক্রমে নিঃশ্বাস গভীর ও প্রশ্বাস ক্ষুদ্র করিতে হইবে। ইহার দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি হয়। প্রশ্বাস ১২ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইলে প্রায়ই ব্যাধির সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রাণায়াম দ্বারা প্রশ্বাসের দীর্ঘতা কমাইতে হইবে। যোগবিজ্ঞানের মতে মানব দেহে ৭২০০০ নাড়ী আছে। অনিয়মিত ও অদীর্ঘ শ্বাসক্রিয়ার ফলে উক্ত নাড়ীগুলিতে বায়ুপ্রবাহ উত্তমরূপে হয় না এবং তজ্জন্য ঐগুলির মধ্যে ময়লা জমে। শরীরে ব্যাধির সম্ভাবনার ইহাই প্রধান কারণ। নাড়ীগুলিতে বায়ুপ্রবাহ ভালরূপে চলিলে রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রবেশ করিলেও অচিরে বিনষ্ট বা বহিষ্কৃত হয়। প্রাণায়ামরূপ নিঃশ্বাস ব্যায়াম দ্বারা শরীরের সকল নাড়ীতে(বা স্নায়ুতে) শুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন সম্ভব। মূত্র-নালীর দ্বারা যেমন দেহের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়,

ঘর্মবহা নালীপথে লোমকূপ দিয়া তেমনি অনেক দূষিত পদার্থ বহির্গমন করে। ঘর্মাবহ নালীর মুখকে লোমকূপ বলে। মানব দেহে অসংখ্য লোমকূপ আছে। দেহের সকল অংশে লোমকূপ সংখ্যা সমান নয়। পিঠে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি স্থানে প্রায় ছয় শত লোমকূপ এবং হাতের তালুতে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে প্রায় পঁচিশ শত লোমকূপ আছে। ঘর্মবহা নালীর দৈর্ঘ্য প্রায় সিকি ইঞ্চি এবং সমগ্র দেহের ঘর্মবহা নালীসমূহ একত্র যোগ করিলে প্রায় ত্রিশ মাইল দার্ঘ হইবে। প্রাণায়াম দ্বারা ঘর্মবহা নালীগুলি এবং লোমকূপের স্বাস্থ্য ও শক্তি সংরক্ষিত হয় এবং ঘর্ম-নির্গমন ভাল ভাবে চলে।

প্রাণায়াম দ্বারা অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও অম্লাদি রোগ সহজে সারিয়া যায়। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুর কার্য্য প্রাণায়াম দ্বারা সুচারুরূপে চলে বলিয়া শরীর নীরোগ, স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়। এক পক্ষ কাল ইহা অভ্যাস করিলে কিঞ্চিৎ ফল দেখা যায়। অন্নাদি স্থুলাহারের মত শুদ্ধ বায়ুও শরীরের একটী প্রধান আহার। এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রথমে দৃঢ় ভাবে হৃদ্‌গত করা দরকার। বিশুদ্ধ বায়ু যত বেশী সেবন করা যায় ততই রক্ত পরিষ্কার হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ এবং সুবৃহৎ কেলগ্ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডাঃ, এইচ, কেলগ্ (Kellogg) এম, ডি, তাহার Itinerary of Breakfast নামক পুস্তকে বলেন যে, অন্নাদি অপেক্ষা বায়ুর প্রয়োজন শরীরে অধিকতর। তাহার হাসপাতালে অনেক রোগী এখনও বাঁচিয়া আছেন, যাহাদের পাকস্থলী অস্ত্রোপচার দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং যাহারা ফুস্‌ফুসে বায়ুগ্রহণ দ্বারা

জীবিত আছেন। আমেরিকার রকফেলার হাসপাতালে কয়েকটী জন্তুর ফুস্‌ফুসকে কেবলমাত্র অক্সিজেন প্রদানে বহু বৎসর বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। জেনেভিভ স্ট্রেবিন তাহার Dynamic Breathing গ্রন্থে বলেন যে, পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষ প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং ১৮ বার প্রশ্বাস ত্যাগ করে। রুগ্ন বা শ্রান্ত অবস্থায় শ্বাসগতির বৃদ্ধি হয়। প্রতি মিনিটে বালকগণ ২৫ বার এবং শিশুগণ ৪০ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।

কিন্তু দীর্ঘজীবি এবং স্বাস্থ্যবান মানুষের নিঃশ্বাস মিনিটে ৬হইতে ৮ বার চলে। সুতরাং গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ দীর্ঘ জীবন লাভের একটি উত্তম উপায়। ই, এ, ফ্লেচার তাঁহার The Law of Rhythmic Breathing নামক গ্রন্থে বলেন, সুগভীর নিঃশ্বাস কিছুক্ষণ লইলে ফুস্‌ফুসের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হইয়া রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষক মিঃ কে, টি, বেহানন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে আসিয়া বোম্বাইতে স্বামী কুবলয়ানন্দের নিকট এক বৎসর কাল থাকিয়া আসন ও প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগের গবেষণা ও অধ্যাপনা করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যহ গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ স্বাস্থ্যলাভের অন্যতম প্রধান উপায়। আমেরিকার Lift Extension Institute এর ডাঃ আর্ভিং ফিসার এবং ডাঃ ইউজেন ফিস্ক হিন্দুদের গভীর নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, প্রত্যেক নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা মস্তিষ্কের আয়তনের যথাক্রমে বিস্তার ও সঙ্কোচন হয়। মস্তিষ্ক দুই অংশে বিভক্ত—বৃহৎ মস্তিষ্ক ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।

প্রথমটির নিম্নে দ্বিতীয়টি অবস্থিত এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা আট গুণ বড়। পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণতঃ দেড় হইতে পৌনে দুই সের পর্য্যন্ত হয়। নারীর মস্তিষ্কের ওজন পৌনে এক সের হইতে সওয়া সের পর্য্যন্ত দেখা যায়। আকারের তুলনায় সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক বৃহত্তম। শীর্ষাসনে ও নিঃশ্বাস ব্যায়ামে মস্তিষ্কে অধিক রক্তপ্রবাহহেতু মস্তিষ্কের দুর্বলতা দূরীভূত ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। পৈশিক পুষ্টিই স্বাস্থ্য ও শক্তির অভ্রান্ত বা অবিসংবাদিত লক্ষণ নহে। হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্রের বায়ুধারণ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। যাহার ফুস্‌ফুস ও হৃদযন্ত্র যত সহনশীল তাহার রোগরাহিত্য ও কর্মশক্তি তত বেশী। প্রাণায়ামে উক্ত শক্তি সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

নিম্নোক্ত তিনটি নিঃশ্বাস ব্যায়াম সকলে নির্ভয়ে করিতে পারেন। উন্মুক্ত বায়ুতে পদ্মাসনে বসিয়া খালি পেটে এই ব্যায়াম করিবেন। যোগাসনের পূর্বে বা পরে এই নিঃশ্বাস ব্যায়াম করা যায়। তালে তালে ধীরে ধীরে দুই নাক দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করুন। নিঃশ্বাস গ্রহণ-কালে মনে মনে ওঁ উচ্চারণ করা যায়। প্রথম প্রথম সময় নির্ধারণের জন্য এক দুই সংখ্যা গণনা করিতে পারেন। যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সেইভাবে পূর্ণ নিঃশ্বাস লউন এবং এক মুহূর্ত না থামিয়া পূর্ববৎ তালে তালে (rhythmically) প্রশ্বাস ত্যাগ করুন। এইরূপে বিশ বার নিশ্বাস গ্রহণ এবং বিশ বার প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেই চলিবে। দিনে দুই বার সকালে ও সন্ধ্যায় এই নিঃশ্বাস ব্যায়াম অভ্যাস করিবেন। ক্রমে ক্রমে গৃহীত নিঃশ্বাস দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তলপেট ভিতরের দিকে টানিয়া লইবেন এবং বুক

ফুলাইবেন। এই ব্যায়ামটি অন্তত তিন মাস করিবার পর দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ব্যায়াম আরম্ভ করিবেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগ' পুস্তকে প্রথম ব্যায়ামটি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়ম জেম্‌স স্বামিজীর নিকট নিঃশ্বাস ব্যায়াম শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া অতিশয় উপকৃত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয় স্বামিজীর 'রাজযোগ' পাঠান্তে প্রাণায়ামের প্রতি আকৃষ্ট হন।

দ্বিতীয় ব্যায়ামটি এইরূপে করিতে হয়। এক নাক বন্ধ করিয়া অন্য নাক দিয়া পূর্ব্ববৎ নিঃশ্বাস লউন এবং উহা এক সেকেণ্ডও না আটকাইয়া খোলা নাকটি বন্ধ করিয়া বন্ধ নাকটি খুলিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করুন। যদি বাম নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইয়া থাকেন তবে ডান নাক দিয়া প্রশ্বাস ছাড়িবেন এবং পুনরায় ডান নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বাম নাক দিয়া ফেলিবেন। এইরূপে বিশ বার অভ্যাস করুন। দ্বিতীয় ব্যায়ামটি তিন মাস অভ্যাসের পর তৃতীয় নিঃশ্বাস ব্যায়ামটি এইরূপে করিবেন। দুই নাকে তালে তালে পূর্ব্বৎ নিঃশ্বাস লইয়াধীরে ধীরে ত্যাগ করুন এবং প্রশ্বাস ত্যাগের পর ১০।১৫।২০ সেকেণ্ড নিঃশ্বাস লইবেন না। ইহার অর্থ, নিঃশ্বাস বাহিরে বন্ধ রাখিবেন। আবার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগান্তে বাহিরে বায়ু রোধ করিয়া আধ মিনিট থাকিবেন। ক্রমে এক মিনিট সময় নিঃশ্বাস না লইয়া থাকা সম্ভব হইবে। তৃতীয় ব্যায়ামটি অন্ততঃ তিন মাস অভ্যাস করিবেন। প্রথম ব্যায়ামটি অভ্যাস না করিয়া দ্বিতীয় ব্যায়ামটি করিবেন না। অথবা দ্বিতীয় ব্যায়ামটি আয়ত্ত না হইলে তৃতীয় ব্যায়ামে হাত দিবেন না।

প্রথম ব্যায়ামটি কয়েক সপ্তাহ করিবার পর মনে প্রফুল্লতা আসিবে, মুখের শুষ্ক রেখাগুলি ও বিষন্ন ভাব লুপ্ত হইবে এবং ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। রাত্রে এমন সুনিদ্রা আসিবে যে, মনে হইবে এইরূপ সুষুপ্তি পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হইবে এবং কণ্ঠের কর্কশতা আর থাকিবে না। প্রকৃত বিশ্রাম কাহাকে বলে অভ্যাসকারী তখন বুঝিতে পারিবেন। ব্যায়ামগুলি অভ্যাসকালে প্রথম অবস্থায় ঘাম হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার কারণ নাই। এই ঘামের সঙ্গে রক্তের দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া যায় এবং শারীরিক সুস্থতা ও বর্ণপ্রসাদ লাভ হয়। ইহার ফলে শরীরের ও মনের জড়তা আসিতে পারে না। এই ব্যায়াম দ্বারা ক্লান্ত স্নায়ু এত স্নিগ্ধ ও সতেজ হয় যে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে (২।১৩) যোগাভ্যাসের প্রাথমিক উপকারিতা এই ভাবে বর্ণিত আছে।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥

অনুবাদ। শরীরের লঘুতা, দেহের ও মনের রোগরাহিত্য, নির্লোভতা, বর্ণের প্রসন্নতা (উজ্জ্বলতা), কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, দেহ-গন্ধের শুদ্ধতা এবং মলমূত্রের স্বল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ যোগসাধকের জীবনে প্রথমে ফুটিয়া উঠে।

পাতঞ্জল যোগসূত্রে (৩।৪৬) আছে, যোগী সাধনফলে রূপলাবণ্যে মণ্ডিত হন। ব্যাসদেব রূপলাবণ্যবানের অর্থ করিয়াছেন, দর্শনীয় এবং কান্তিমান। সুতরাং আসনের সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য এবং মনের শুদ্ধি ও শক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে লাভ করা যায়।

প্রাণায়ামে শ্বাসতত্ত্ব

আসনের ন্যায় প্রাণায়ামও এক প্রকার যৌগিক ব্যায়াম। তবে প্রাণায়াম উত্তম নিঃশ্বাস ব্যায়াম, দৈহিক ব্যায়াম নহে। ইহা এত বৈজ্ঞানিক ও উপকারী যে, ইহার তুল্য নিঃশ্বাস ব্যায়াম জগতে কোথাও অদ্যাপি উদ্‌ভাবিত হয় নাই। প্রাণায়াম বিজ্ঞান ভালরূপে বুঝিতে হইলে শ্বাসতত্ত্ব প্রথমে অবগত হওয়া আবশ্যক।

পর্য্যায়ক্রমে থোরাক্সের (বক্ষঃস্থলের) সম্প্রসারণ ও সংকোচন দ্বারা বায়ু ফুস্‌ফুসে গৃহীত ও তথা হইতে পরিত্যক্ত হয়। ইহার নাম শ্বাসক্রিয়া। ফুস্‌ফুস্‌, নাসিকা এবং ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল স্নায়ু ও রক্তবাহী শিরা প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত। নাসিকা হইতে ফুস্‌ফুস পর্য্যন্ত বহু যন্ত্র শ্বাসগতির সময় সক্রিয় হয়। নাসারন্ধ্র একটি পাতলা নরম প্রাচীর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি দর্পণ সম্মুখে ধরিলে এবং উহার উপর পশ্চাৎ দিক হইতে আলোক ফেলিলে দেখা যায়, যাহাকে আমরা নাসিকা বলি তাহা সুদীর্ঘ শ্বাসযন্ত্রের বহির্প্রান্ত মাত্র। ইহার অন্তর্প্রান্ত গলদেশে ফ্যারিংশের (pharynx) প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নাসিকার মধ্যে মোটা ব্রাসের চুলের মত কতকগুলি কেশ অছে। যেগুলি নাসিকার সম্মুখভাগে উৎপন্ন সেগুলি পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত এবং যেগুলি পশ্চাদ্‌ভাগে উৎপন্ন সেগুলি সম্মুখদিকে প্রসারিত। নাসিকার রন্ধ্রদ্বয় মুখগহ্বরস্থ তালুদেশের উর্দ্ধে এবং মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত।

যদ আমরা নাসিকাদ্বয়ের উচ্চতা তিন ভাগে ভাগ করি তাহা

হইলে উর্ধস্থ এক-তৃতীয়াংশকে ঘ্রানস্থান এবং নিম্নস্থ দুই-তৃতীয়াংশকে শ্বাসস্থান বলা যায়। ঘ্রাণ এবং শ্বাস এই দুইটি নাসিকার কার্য্য। স্বাভাবিক ও প্রশান্ত শ্বাসে নাসিকার নিম্নস্থ দুই অংশ মাত্র ব্যবহৃত হয়; কিন্তু নিঃশ্বাস ব্যায়ামকালে উর্ধ অংশও ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার সময় ঘ্রাণস্থানের বায়ু অধিকতর ঘন ও ভারী থাকে। ঘ্রাণ স্থান ১২ হইতে ২০টি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুমূল দ্বারা আবৃত। এই স্নায়ুমূল গুলির দ্বারাই ঘ্রাণ অনুভূত হয়। ঘ্রাণশক্তির সূক্ষ্মতা আশ্চর্য্যজনক। এক কণা কস্তুরীর এক কোটীর তিন অংশ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘ্রাণ লওয়া যায়। স্নায়ুমূলগুলিতে আর্দ্রতার আধিক্য হইলে ঘ্রাণশক্তি কমিয়া যায়। সেইজন্য সর্দি লাগিলে ঘ্রাণশক্তির হ্রাস হয়। উগ্র গন্ধ দ্বারা তত্রস্থ স্নায়ুমুলগুলি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য তীব্র সুগন্ধ কিছুক্ষণ লইবার পর উহার উগ্রতা আর তত অনুভূত হয় না। গন্ধবাহী কর্ণাগুলি অত্যুষ্ণ বা অত্যার্দ্র হইলে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বোঝা যায় না।

বাহিরের বায়ু যথোচিত উষ্ণ ও আর্দ্র না থাকিলে ফুস্‌ফুসের অনিষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য শ্বাসনালীতে যে সকল রক্তবাহী শিরা আছে সেগুলি গৃহীত বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা সমভাবে বৃদ্ধি করে। এইরূপে শ্বাসপথে আবশ্যকীয় উত্তাপ ও আর্দ্রতা সর্বদা রক্ষিত হয়। ফ্যারিংশ দিয়া বায়ু যাতায়াত করে। ফ্যারিংশের বহিঃপ্রান্ত মুখের সঙ্গে এবং অন্তপ্র্রান্ত ইসোফেগাস ও ল্যারিংশের সহিত সংযুক্ত। গৃহীত বায়ু নাসাপথ, ফ্যারিংশ, ল্যারিংশ ট্রাকিয়া অতিক্রম করিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হয়। চর্বিত খাদ্য বা গৃহীত পানীয়ের বিন্দুমাত্র শ্বাস পথে আসিলে ভীষণ কাশি উঠে, অর্থাৎ বিষম লাগে। উক্ত কাশির

কারণ অবাঞ্ছিত অনাদৃত অতিথিকে বিতাড়িত করা। ইসোফেগাস ও ল্যারিংশ যথাক্রমে ঘাড়ের পশ্চাৎ ও সম্মুখ অংশে বিদ্যমান। ল্যারিংশ জিহ্বামূল হইতে নিম্ন মুখে প্রসারিত। ইহা আকারে বাক্সের মত এবং দৈর্ঘ্যে দুই ইঞ্চির কম। চলিত ভাষায় ইহাকে স্বর বাক্স (voicebox) বলে। ইহার মধ্যে বায়ু ঢুকিয়া তরঙ্গায়িত হইলে শব্দ সৃষ্টি হয়।

ল্যারিংশ ট্রাকিয়াতে যাইয়া শেষ হইয়াছে। ট্রাকিয়া আকারে নলের মত এবং প্রায় চার ইঞ্চি দীর্ঘ। উক্ত নলের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি। ১৬ হইতে ২০ টী গোলাকার তন্তু (ring) দ্বারা ইহা নির্মিত। ইহাতে অনেকগুলি শ্লেষ্মাগ্রন্থি অবস্থিত। এই সকল গ্রন্থি শ্বাসনালীকে সর্বদা আর্দ্র রাখে। শ্লেষ্মা অধিক জমিলে উহা কাশির দ্বারা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইসোফেগাস ট্রাকিয়ার পশ্চাতে এবং ল্যারিংশের নিম্নে বিরাজমান। খাদ্যাদি গলাধঃকরণের সময় ব্যতীত ইহার দ্বার সর্বদা রুদ্ধ থাকে। ল্যারিংশের দ্বার সদা মুক্ত থাকায় শ্বাসক্রিয়া চলে। ট্রাকিয়া বক্ষমধ্যে অবতরণ করিয়া দুইটী নলে বিভক্ত হইয়াছে। নলদ্বয়কে ব্রঙ্কাস্ (bronchus) বলে। বাম নলটি বাম ফুস্‌ফুসে এবং ডান নলটী ডান ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট। ফুস্‌ফুসদ্বয়ের মধে যাইয়া নল দুইটী সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্মতম নলগুলির ব্যাসার্ধ ১/৪০ ইঞ্চি মাত্র। পরে এই সকল নল কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া সূক্ষ্মতর বায়ুকোষসমূহের (aricells) আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক বায়ুকোষের ব্যাস প্রায় ১/৫০ ইঞ্চি মাত্র। নিশ্বসিত বায়ু বায়ুকোষগুলির মধ্য দিয়া রক্তে মিশ্রিত হয়। বায়ুনলের শেষাংশে লম্বমান বায়ুকোষগুলিকে থোলো থোলো আঙ্গুরের মত দেখায়।

বায়ুকোষগুলি শত শত সূক্ষ্ম কৈশিকজালে (capillaries) সমাবৃত। সূক্ষ্মতম কৈশিকের ব্যাস ১/১০০০০ হইতে ১/৩০০০০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। স্বামী কুবলয়ানন্দ তৎসম্পাদিত 'যোগমীমাংসা' ত্রৈমাসিকে (প্রথম বর্ষের চতুর্থ খণ্ডে) 'রক্ত এবং রক্তপ্রবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কৈশিক, ধমনী ও শিরা—এই তিনটী দিয়াই রক্ত প্রবাহিত হয়। কৈশিকের সংখ্যা কল্পনাতীত। দুইটী ফুসফুসে এত কৈশিক আছে যে, সেগুলি এক রেখায় জুড়িলে বোম্বাই হইতে সুদূর লণ্ডন পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইবে। কৈশিকজালের মধ্যে বায়ুকোষসমূহ অবস্থিত। বায়ুকোষগুলির অন্য নাম এ্যালভিওলি (alveoli)। ইহার একবচনে alveolus হয়। এ্যালভিওলাস শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র গহ্বর বা কোষ (small cavity)। এ্যালভিওলার (alveolar) বায়ু সম্বন্ধে হাল্‌ডেন ও প্রিষ্টলি নামক ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদ্বয় অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন। জে. এস. হাল্‌ডেন (J. S. Haldane) প্রণীত Respiration (শ্বাসক্রিয়া) নামক ইংরাজি পুস্তকে এই সকল গবেষণা ও উহাদের সিদ্ধান্ত বিবৃত। স্বামী কুবলয়ানন্দ 'যোগমীমাংসা' পত্রিকায় (৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যায়) এ্যালভিওলার (বায়ুকোষস্থ) বায়ু সম্বন্ধে যোগবিজ্ঞানের আলোকে অনেক অভিনব তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যে বায়ুকোষের মধ্যে নির্মল বায়ু প্রবেশ করে তাহা দুইটী অতি পাতলা তন্তুময় পর্দা দ্বারা বেষ্টিত। প্রথমটী কৌষিক (কোষসংশ্লিষ্ট) এবং দ্বিতীয়টী কৈশিক সংলগ্ন। পর্দাদ্বয়ের বাহিরে কৈশিকজালের মধ্য দিয়া রক্ত কেশবৎ সূক্ষ্ম স্রোতে প্রবাহিত। পর্দাদ্বয় সংযুক্তভাবেও এত পাতলা যে, উহাদের মধ্য দিয়া অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-

অক্সাইডের অবাধ বিনিময় চলে। কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ফুস্‌ফুসদ্বয়ের মধ্যে যে রক্ত উপস্থিত থাকে তাহা অত্যন্ত পাতলা ভাবে প্রসারিত করিলে অন্ততঃ এক হাজার বর্গ ফুট স্থান আবৃত হইবে। ফুস্‌ফুসদ্বয় দুইটি কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রথম কোষটীর নাম প্লুরা এবং দ্বিতীয়টীর নাম থোরাক্স। এই প্লুরা দুইটী পর্দার সমষ্টি। পর্দাদ্বয় স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় পরস্পর এত সন্নিহিত থাকে যে, উভয়ের মধ্যে আদৌ ব্যবধান থাকে না; কিন্তু প্লুরিসি রোগে বা অন্যান্য প্রদাহকর অবস্থায় পর্দাদ্বয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক সৃষ্টি হয়। ফুস্‌ফুসদ্বয় স্পঞ্জতুল্য (spongy) বস্তু। ফুটবলের যেমন চর্মময় কভার ও রবার-নির্মিত ব্লাডার আছে ফুস্‌ফুসের তেমনি থোরাক্স ও প্লুরা। ফুস্‌ফুসদ্বয় সম্মুখে অদীর্ঘ ও পশ্চাতে সুদীর্ঘ। সম্মুখে উহারা ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থি পর্য্যন্ত এবং পশ্চাতে একাদশ পঞ্জরাস্থি পর্য্যন্ত আলম্বিত। ডায়াফ্রামকে উহাদের মেজে (floor) বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বয়স্ক ব্যক্তির ডান ফুস্‌ফুসের ওজন বাইশ আউন্স এবং বাম ফুস্‌ফুসের ওজন বিশআউন্স। ফুস্‌ফুসের সহিত সংযুক্ত সূক্ষ্ম কৈশিকজাল স্থূল ও স্থূলতর হইয়া শিরা ও ধমনীরূপে হৃৎপিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ। হৃৎপিণ্ড বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ বাম দিকে অবস্থিত। ইহা পেশীময় একটী ফাঁপা (hollow) যন্ত্র। ইহা সাধারণ আকারে সওয়া চার ইঞ্চি দীর্ঘ, সাড়ে তিন ইঞ্চি প্রস্থ এবং আড়াই ইঞ্চি পুরু। নারীর হৃৎপিণ্ড পুরুষের হৃৎপিণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর। হাতের বদ্ধ মুষ্টির আকারে হৃৎপিণ্ডের পরিমাপ করা হয়।

এ. টি. স্কোফিড (A. T. Schofied) তাঁহার "শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী" (Articles on Physiology) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "প্রত্যহ নিঃশ্বাস গ্রহণকালে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা

কোন ব্যক্তিকে পাঁচ শত ফুট উচ্চ সেণ্টপল গির্জার চূড়ায় তুলিতে পারে। রক্তপ্রবাহে যে বিপুল শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা উহা অপেক্ষা ছয় গুণ অধিক। নিঃশ্বাস আয়াসসাপেক্ষ পৈশিক ব্যায়াম। ইহাতে বক্ষঃগহ্বর প্রশস্ততর, দীর্ঘতর ও গভীরতর হয়। প্রশ্বাসে বক্ষঃস্থল বিনা আয়াসে মৌলিক অবস্থায় প্রত্যাগত হয়।" ফুস্‌ফুসদ্বয় নমনীয় তন্তুরাজিতে পরিপূর্ণ। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে ফুস্‌ফুস বিস্তৃত হইবার সহিত প্রসারিত হয়। সাধারণ নিশ্বাসে তন্তুসমূহকে প্রসারিত করিতে যে শক্তি আবশ্যক হয় তাহা ১৭০ পাউণ্ডের সমান। প্রশ্বাসে দৈনিক মোট যে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ ২১ ফুট-টন। অসাধারণ বা আয়াসযুক্ত নিঃশ্বাসে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি আবশ্যক হয়। তখন নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে বুকের ও ঘাড়ের পেশীসমূহ সক্রিয় হইয়া উঠে। ইহা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কথা বলা, গান-করা, বাঁশী বাজান প্রভৃতি স্বেচ্ছাকৃত প্রশ্বাস ব্যায়াম এবং হাঁচা, কাশা ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত প্রশ্বাস ব্যায়াম। এই উভয় প্রকার ব্যায়ামে তলপেটের পেশীগুলি কার্য্যকরী হয়। গভীর নিঃশ্বাসের পরে যখন বায়ু ভিতরে রুদ্ধ হয় তখন নিঃশ্বাস-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি সঙ্কুচিত এবং অন্তঃস্থিত শ্বাসদ্বার (glottis) দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকে। গভীর প্রশ্বাসের পরে যখন বায়ু বাহিরে রুদ্ধ হয় তখন প্রশ্বাস-সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহ সঙ্কুচিত এবং শ্বাসদ্বার (glottis) বন্ধ থাকে। যখন শ্বাসদ্বার খোলা থাকে তখন ফুস্‌ফুসে অবস্থিত বায়ুর সহিত বহির্দেশস্থ বায়ু সংযুক্ত হয়। গলাধঃকরণ সময়ে অন্তঃস্থিত

১ মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে এক টন ভার ২১ ফুট তুলিতে বা একুশ টন ভার একফুট তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে ফুট-টন বলে।

শ্বাসদ্বার বন্ধ থাকে। এতদ্ব্যতীত দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা বহির্দ্দেশস্থ বায়ুর গতি স্বাধীন ভাবে চলে। বাহিরের বায়ু সর্বদা বায়ুমণ্ডলের চাপের অধীন। যে স্থানের বায়ুচাপ নিম্নতর তথায় বাহিরের বায়ু স্বতঃই গমন করে। সে স্থানে কিছুক্ষণ পরে বাহিরের ও ভিতরের বায়ুচাপ সমান হইয়া যায়। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে ঠিক ইহাই ঘটে। যখন ফুস্‌ফুসদ্বয় বক্ষঃস্থলের বিস্তারহেতু প্রশস্ততর, গভীরতর ও দীর্ঘতর হয় তখন ফুস্‌ফুসের অন্তর্বর্তী বায়ুচাপ নিম্নতর হয় এবং বাহিরের বায়ু শ্বাসনালী দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুস বায়ুপূর্ণ হইলে ভিতরের ও বাহিরের বায়ুর চাপ সমান হওয়ায় নিঃশ্বাসের ক্ষণিক বিরাম ঘটে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিঃশ্বাসকালে পঞ্জর আরোহণ ও ডায়াফ্রাম অবতরণ করে এবং তলপেট একটু স্ফীত হয়। যখন শ্বাসক্রিয়ার পৈশিক যন্ত্র সুস্থ থাকে তখন পঞ্জরের উত্থান এবং তলপেটের স্ফীতি সমান অনুপাতে চলে; কিন্তু শ্বাসযন্ত্র দোষযুক্ত বা দুর্বল হইলে বক্ষঃস্থল বা তলপেট অধিক ফুলিয়া উঠে। সেইজন্য তখন শ্বাসও দুই প্রকার হয়। তন্মধ্যে একটিকে বুকের শ্বাস এবং অপরটিকে তলপেটের শ্বাস বলা হয়। জরা বা ব্যাধির জন্য যখন বক্ষঃস্থল দুর্বল হইয়া যায় তখন তলপেটের শ্বাস অধিক চলে। প্যাণ্ট বা ধুতি প্রভৃতি পোষাক পরিচ্ছদ কোমরে দৃঢ়রূপে পরার জন্য অনেকের তলপেটের প্রসারণ বাধিত হয়। তাহাদের বুকের নিঃশ্বাস বেশী চলে। যখন বুক নামিয়া যায় এবং ফুস্‌ফুসের বায়ুচাপ বাহিরের বায়ুচাপ অপেক্ষা অধিকতর হয় তখন ফুস্‌ফুসের বায়ু বহিষ্কৃত হয়। ইহাকে প্রশ্বাস বলে। ইহাই প্রশ্বাসের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। প্রশ্বাসের পরে বাহিরের ও ভিতরের বায়ুচাপ সমান হওয়ায় শ্বাসক্রিয়া ক্ষণ কাল বন্ধ থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক মিনিটে শ্বাসগতি চৌদ্দ হইতে কুড়ি বার হয়।

যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তাহার পরিমাণ নিঃশ্বাসের গভীরতার উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক সাধারণ নিঃশ্বাসে ৫০০ সি. সি. অথবা কিঞ্চিদধিক ৩০ বর্গ ইঞ্চি বায়ু গৃহীত হয়। প্রত্যেক প্রশ্বাস দ্বারাও উক্ত পরিমাণ বায়ু ফুসফুস হইতে বাহিরে যায়। সুতরাং সাধারণতঃ ৩০ ঘন ইঞ্চি পরিমিত বায়ু যাতায়াত করে। ইহাকে প্রবাহী বায়ু (tidal air) বলে। কিন্তু নিঃশ্বাস গভীরতর হইলে অধিকতর পরিমাণে বায়ু গৃহীত হয়। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বয়স্ক ব্যক্তি গভীরতম নিঃশ্বাসে ১৬০০ সি, সি, অতিরিক্ত বায়ু গ্রহণ করিতে পারেন। খুব জোরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিল বয়স্ক ব্যক্তি ১৬০০সি. সি. (c. c.) অতিরিক্ত বায়ু ত্যাগ করেন। কিন্তু গভীরতম প্রশ্বাস দ্বারাও বায়ু-কোষগুলি একেবারে বায়ুশূন্য হয় না। ফুস্‌ফুসের মধ্যে সর্বদা ১৬০০ সি্ সি্ বা ২০০ ঘন ইঞ্চি বায়ু জমা থাকে। ইহাকে স্থায়ী বায়ু বলে। ফুসফুসে কখনও ১০০ ঘন ইঞ্চির কম বায়ু থাকে না। গভীর নিশ্বাসের পরে খুব জোর প্রশ্বাস ছাড়িলে প্রবাহী বায়ু ৫০০ সি. সি. এবং অতিরিক্ত বায়ু ১৬০০ সি. সি, অবশিষ্ট বায়ু ১৬০০ সি. সি. মোট ৩৭০০ সি. সি. বায়ু পরিত্যক্ত হয়। এই বায়ুর দ্বারাই শ্বাসশক্তি পরিমিত হয়। ইহাকে প্রাণশক্তি বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত ১৬০০ সি. সি. স্থায়ী বায়ু যোগ করিলে মোট ৫৩০০ সি. সি. হয়। ইহাই ফুস্‌ফুসের সাধারণ সামর্থ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির ওজন ও উচ্চতা অনুসারে শ্বাস-শক্তি এবং ফুস্‌ফুসের সামর্থ্য পরিগণিত হয়।

আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি উহার ১০০ ভাগের ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২০·৯৬ ভাগ অক্সিজেন এবং ·০৪ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড। আমরা যে বায়ু ত্যাগ করি তাহার ১০০ ভাগের মধ্যে ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন, ১৬·০২ ভাগ অক্সিজেন এবং ৪·৩৮ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। ইহা হইতে দেখা যায়। প্রশ্বাস বায়ুতে ৪·৯৪ অংশ অক্সিজেন কমিয়াছে এবং ৪·৩৪ অংশ কর্বন ডাই-অক্সাইড বাড়িয়াছে। যেটুকু অক্সিজেন কমিয়াছে তাহা রক্তে মিশ্রিত এবং যেটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়িয়াছে তাহা রক্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত গণনা হইতে জানা যায়, যে অক্সিজেন গৃহীত হয় তাহার পরিমান পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা ৬০ অধিক। এইটুকু অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃজনে এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত। দেহে প্রবহমান রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে কেন ? ইহার উত্তর জানিতে হইলে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মানব দেহ সর্বদা ক্রিয়াশীল। বাহ্যত: বিশ্রামকালেও ইহার ক্রিয়া বন্ধ হয় না। রক্তবাহী যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাক যন্ত্রাদির বিশ্রাম কখনো ঘটে না। তাহারা অবিরাম কার্য্যরত থাকে। এমন কি, সুষুপ্তিকালেও তাহাদের বিশ্রাম হয় না। অবিরাম কর্মতৎপরতা হেতু তন্তুসমূহের যে ক্ষয় হয় তাহা পরিপূরণ এবং অসার পদার্থ দেহ হইতে অপসারণ নিমিত্ত পুষ্টি আবশ্যক। এই পুষ্টি শুধু খাদ্য ও পানীয় হইতে গৃহীত হয় না, নিশ্বসিত বায়ুর অক্সিজেন হইতেও হয়। অক্সিজেন প্রধানতম পুষ্টিকর পদার্থ। কয়েক মুহূর্তও আমরা অক্সিজেন ব্যতীত বাঁচিতে পারি না। সেইজন্য দেহের রক্ত ফুসফুসে

আসিয়া নিশ্বসিত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বিষাক্ত ও দূষিত বায়ু। ইহা দেহমধ্যে অধিক ক্ষণ থাকিলে মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা বমি বমি করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এমন কি, ইহার আধিক্য হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংযোগে ধমনীপ্রবাহী রক্ত উজ্জ্বল লাল হয়। ইহা সহজে পরীক্ষা করিয়াও দেখা যায়।

দূষিত বায়ুমাত্রই স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। দূষিত বায়ু সেবনে সর্দি, কাশি, হাঁপানী, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মে। অক্সিজেন ব্যতীত আগুন জ্বলিতে পারে না। একটি বড় কাঁচের পাত্রে একটি জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া উহার মুখে ঢাকা দিলে কিছুক্ষণ পরে বাতিটি নিভিয়া যায়। পাত্রমধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস এবং কার্বনিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় বাতি জ্বলিতে পারেনা সেইরূপ দেহপাত্রে অক্সিজেন কমিলে ও কার্বনিক এসিড বাড়িলে জীবদ-প্রদীপ নিভিয়া যায়। রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িলে শ্বাসগতি দ্রুততর এবং অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িলে শ্বাসগতি ধীরতর হয়। অক্সিজেন ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব। অক্সিজেন-প্রাচুর্য্য দ্বারাই স্বাস্থ্য রক্ষিত ও আয়ু বর্ধিত হয়।

শারীর বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণায়াম নিঃশ্বাস ব্যায়াম মাত্র এবং ইহার উদ্দেশ্য শ্বাসগতির নিয়ন্ত্রণ (regulation of breath)। অধিক সংখ্যক শরীরতত্ত্ববিদগণ কয়েক দশক ব্যাপী গভীর গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বায়ুকোষস্থ বায়ুতে (alveolar air) শতকরা যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড (co^2) থাকে তাহার দ্বারাই শ্বাসগতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাপের (pressure) দ্বারাই উক্ত নিয়ন্ত্রণ ঘটে, উহার পরিমাণের দ্বারা নহে। এই অধ্যায়ে বায়ু-চাপের অর্থেই বায়ুর পরিমাণ উল্লিখিত। শ্বাসের কার্য্য রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ এবং নিশ্বসিত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণপূর্বক উহা রক্তে সংমিশ্রণ। যে সকল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শ্বাসতত্ত্বের গবেষণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হাল্‌ডেন ও প্রিস্টলীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বায়ুকোষস্থ বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত—এই সম্বন্ধে উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা ডবলিউ. ডি. হ্যালিবার্টন (W. D. Halliburton) তাহার শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (Hand brok of physiology.) বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হাল্‌ডেন স্বীয় শরীরে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন নিশ্বসিত বায়ুতে শতকরা ৫.৫৪ অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং প্রশ্বসিত বায়ুতে শতকরা ৫.৭২ অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। প্রিষ্টলীর উপর সদৃশ পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখিলেন প্রিষ্টলীর নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে যথাক্রমে শতকরা ৬.১৭ এবং ৬.৩৯ অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। গড়ে হাল্‌ডেন ও প্রিষ্টলীর বায়ুতে যথাক্রমে ৫.৬৩ এবং ৬.২৮ কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেল। যখন উভয়ে বিশ্রাম-রত ছিলেন এবং তাহাদের শ্বাসগতি স্বাভাবিক ছিল তখনই এই সকল পরীক্ষা হয়।

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদ্বয় সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে এই চারিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।—(১) স্বাভাবিক শ্বাসকালে নিশ্বাসের শেষে ৮০০ সি. সি. বায়ু ত্যাগ করিবার পর যে বায়ু ছাড়া হয় তাহাই নির্ভরযোগ্য বায়ুকোষস্থ বায়ু। (২) বায়ুকোষের নিশ্বসিত ও

প্রশ্বসিত বায়ুর দুইটী নমুনা লইলে নিশ্বাসের নমুনা অপেক্ষা প্রশ্বাসের নমুনায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অধিকতর থাকে। (৩) বায়ুকোষস্থ বায়ুর-উৎপাদন সর্বত্র সমান। সুতরাং বায়ুকোষের তলদেশ এবং মধ্যদেশের বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সমান থাকে। (৪) স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের শ্বাসগতি বায়ুকোষস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বায়ুকোষে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যল্প বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে শ্বাসগতির বেগ অতিশয় বাড়ে বা কমে। হাল্‌ডেন বলেন যে, বায়ুকোষে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা শতকরা '০১ বাড়িলে বা কমিলে শ্বাসগতি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতি বায়ুকোষসমূহের অদ্ভুত স্পর্শকাতরতা ঊর্ধমুখে এবং নিম্নমুখে এই ভাবে স্থিরীকৃত। বায়ুকোষে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা শতকরা '০১ বাড়িলে বা কমিলে বায়ু-কোষের বায়ুর গতি শতকরা পাঁচ গুণ বাড়ে বা কমে; অর্থাৎ ফুসফুসে প্রত্যেক মিনিটে প্রায় ৪০০ সি. সি. বায়ু বাড়ে বা কমে।

বোম্বাই নগরীর স্বামী কুবলয়ানন্দ প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে হাল্‌ডেনের সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক। তিনি চারজন স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির উপর আট বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, হাল্‌ডেনের সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য নহে। হালডেনের মতে প্রশ্বাসকালে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বায়ুকোষে বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্রাম সময়ে প্রতি সেকেণ্ডে উক্ত বৃদ্ধির হার '১ মাত্র। স্বামী কুবলয়ানন্দ গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বায়ুকোষের তলদেশ অপেক্ষা মধ্যদেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অধিকতর। উক্ত গবেষণায় চারজন

ব্যক্তি সাত সেকেণ্ডে যে প্রশ্বাস ত্যাগ করে তাহার নমুনা গৃহীত হয়। প্রথম পাঁচ সেকেণ্ডে ৪০০ হইতে ৫০০ সি. সি বায়ু ব্যতীত অবশিষ্ট বায়ু বহির্গত হয়। ষষ্ঠ সেকেণ্ডে ২০০ হইতে ২৪০ সি. সি বায়ু নির্গত হয় এবং অবশিষ্ট বায়ু সপ্তম সেকেণ্ডে নিঃশেষে বহির হয়। উভয় নমুনা রবারের নলে রাখা হইল। ষষ্ঠ ও সপ্তম সেকেণ্ডের নমুনাদ্বয়ে যথাক্রমে বায়ুকোষের মধ্য দেশের এবং তলদেশের বায়ু ছিল। উভয় নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, মধ্যদেশের বায়ুতে অধিকতর মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। সুতরাং বায়ুকোষের বায়ুর উপাদান সর্বত্র সমান—হালডেনের এই সিদ্ধান্ত সত্য নহে।

হালডেনের মতে নিঃশ্বাস বায়ুর নমুনায় প্রশ্বাস বায়ুর নমুনা অপেক্ষা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অল্পতর। স্বামী কুবলয়ানন্দ এই সম্বন্ধে ছয়টি পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্তটি ব্যতীত অন্য পাঁচটিতে যে ফল পাওয়া গেল তাহা হালডেনের সিদ্ধন্তের বিপরীত। স্বামী কুবলয়ানন্দের সিদ্ধান্ত এই যে, গভীরতম প্রশ্বাসের পরে গভীরতম নিঃশ্বাস হইতে যে বায়ুকোষস্থ বায়ু সংগৃহীত হয় তাহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অল্পতর এবং গভীরতর নিশ্বাসের অন্তে গভীরতম প্রশ্বাস হইতে সমস্ত প্রশ্বসিত বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অধিকতর। স্বামী কুবলয়ানন্দ যে আটটি পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিররণ পাঠ করিলে প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহার গবেষণা যোগ-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। আসন ও প্রাণায়ামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একমাত্র তাহার গবেষণায় পাওয়া যায়।

শ্বাসগতির দ্বারা দেহস্থ প্রাণাদি দশ বায়ুর ক্রিয়া পরিচালিত হয়। দেহে যে দশটি বায়ু আছে তাহাদের নাম—প্রাণ, অপান, সমান,

উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ বায়ুর মধ্যে প্রথম পাঁচটি প্রধান। প্রধান পাঁচটির মধ্যে আবার প্রাণ ও অপাণ প্রধান। এতদুভয়ের মধ্যে প্রাণই জ্যেষ্ঠ। কারণ ইহাই জীবাত্মাকে ধারণ করে। দশটী প্রধান নাড়ীতে দশটী বায়ু প্রবাহিত হয়। ত্রিশিখী ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ অনুসারে মুখ ও নাসিকার মধ্যস্থল, হৃদয় নাভিমণ্ডল ও পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রাণবায়ুর স্থান। অপান বায়ুর স্থান মলদ্বার, উপস্থ, উরুদ্বয়ও জানুদ্বয়। ইহার দ্বারা মলমূত্র ও বায়ু নিঃসৃত হয়। সমান বায়ু সর্বগাত্রে পরিব্যাপ্ত। উদান বায়ু পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের সন্ধিস্থলসমূহে অবস্থিত। ব্যান বায়ুর স্থান কর্ণদ্বয়, উরুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, গলদেশ এবং গোড়ালী প্রভৃতি। নাগাদি পঞ্চ বায়ু ত্বক্ ও অস্থি প্রভৃতিতে প্রবাহিত। প্রাণাদি বায়ুর বর্ণনাও যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

প্রাণবায়ুর প্রধান কার্য্য নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। অন্যান্য বায়ুর ক্রিয়াও প্রাণবায়ুর দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং শ্বাসগতির দ্বারা দেহের সমস্ত ক্রিয়া চলিতেছে। চৈনিক ঋষি লাউৎজে বলিয়াছেন, আমার শ্বাস ক্রিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত চলে। এই সারগর্ভ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, শ্বাসই দেহের সর্ব প্রকার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসগতি নিয়মিত, সুদীর্ঘ, সুগভীর ও সংবর্ধিত হয়। ইহার ফলে দেহ নীরোগ ও সবল থাকে।

প্রাণায়াম বিজ্ঞান

আসন আয়ত্ত হইলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। বিশেষতঃ দুই একটি ধ্যানাসনে ঘণ্টাধিক কাল আরামদায়ক উপবেশনে অভ্যস্ত হইবার পর প্রাণায়াম আরম্ভ করা উচিত। আসনাভ্যাসে অগ্রসর না হইয়া প্রাণায়াম করিলে সুফল লাভ সুদূরপরাহত।

প্রাণায়ামের অর্থ কি? প্রাণায়ামের শব্দগত অর্থ শ্বাসগতির ক্ষণিক বিরাম। প্রাণ এবং আয়াম এই দুই শব্দের সংযোগে প্রাণায়াম শব্দ নিষ্পন্ন। প্রাণ = শ্বাস এবং আয়াম = বিরাম। পরবর্ত্তী যৌগিক সাহিত্যে প্রাণায়ামের অর্থ কুম্ভক ধরা হইয়াছে। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, ভগবান পতঞ্জলি পূরক, কুম্ভক বা রেচক শব্দ তাঁহার যোগ-সূত্রের কোথাও ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য তিনি এই ক্রিয়াত্রয়ের পরোক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাচীনতম ভাষ্যকার ব্যাসদেব, যিনি প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সূত্রকারের ন্যায় উপরোক্ত শব্দত্রয় ব্যবহার করেন নাই। ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই সকল শব্দ পরবর্ত্তী যুগে আবিষ্কৃত। আধুনিক যোগ সাহিত্যে প্রাণ বা প্রাণায়াম সূক্ষ্ম শক্তি অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু পতঞ্জলির যোগসূত্রে উক্ত অর্থ অভিপ্রেত নয়। যোগসূত্রে প্রাণ শব্দ একবার এবং প্রাণায়াম শব্দ দুই বার মাত্র পাওয়া যায়। এই তিন স্থলেই শব্দযোজনা এত পরিষ্কার যে কষ্ট কল্পনা দ্বারাও প্রাণ শব্দের অর্থ শ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ সম্ভব নয়। ব্যাসপ্রমুখ ভাষ্যকারগণও পতঞ্জলির মতানুবর্ত্তী।

যোগসূত্রের প্রথম পাদের ৩৪ সূত্রটি এই—"প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" প্রাণের (শ্বাসের) প্রচ্ছর্দন (রেচক) ও বিধারণ

(কুম্ভক) দ্বারা মনঃসংযম সম্ভব। ব্যাসাদি ভাষ্যকার উদ্ধৃত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, প্রাণ = কোষ্ঠয়োঃ বায়ু অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের বায়ু। সুতরাং সূত্র ও ভাষ্যকার উভয়ে একমত যে, প্রাণ শব্দের অর্থ শ্বাস-বায়ু। যোগসূত্রের দ্বিতীয় পাদের ২৯ সূত্রটী এই—"যমনিয়মাসন-প্রাণায়ামপ্রত্যাহার ধারণাধ্যানসমাধ্বয়ঃ অষ্টাবঙ্গানি যোগস্য।" অর্থাৎ যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই সূত্রে প্রাণায়াম যোগের চতুর্থ অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট। যোগসূত্রের দ্বিতীয় পাদের ৪৯ সূত্রটি এই—"তস্মিন্ সতি শ্বাস- প্রশ্বাসয়ো গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" ইহার অর্থ নিঃশ্বাস (যে বায়ু- পুরক দ্বারা ফুসফুসে গৃহীত হয়) এবং প্রশ্বাসের (যে বায়ু রেচক দ্বারা পরিত্যক্ত হয়) সরল গতির বিচ্ছেদ (বিরাম) কে প্রাণায়াম বলে। হঠযোগের শাস্ত্রকারগণ তখনই প্রাণের অর্থ সূক্ষ্ম শক্তি ধরিয়াছেন যখন তাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু প্রাণায়ামের উক্ত অর্থ ধরেন নাই সেইজন্য স্বামী কুবলয়ানন্দজীর মতে প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাসগতির বিরাম।

যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের এই সংজ্ঞাটীও পাওয়া যায়—"প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।" ইহার অর্থ, প্রাণ এবং অপান বায়ুর সংযোগকে প্রাণায়াম বলে। শঙ্করাচার্য শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের (২।৭) ভাষ্যে প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য এই ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

প্রাণায়াম-বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্।
তস্মাৎ নাতপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাৎ ইতি শ্রুতি ॥

অনুবাদ—যেহেতু প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে

আত্মদর্শন হয় সেইহেতু বেদান্তসারে প্রাণায়াম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধন আর কিছুই নাই।

শিব সংহিতায় (৩।৬১) প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে বন্দিত।—

প্রাণায়ামেণ যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বার্য্যকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥

অনুবাদ—যোগীবর প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা অণিমা-লঘিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য লাভান্তে পাপ ও পুণ্যের সাগর অতিক্রম পূর্বক ত্রিভুবনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন।

পতঞ্জলির মতে প্রাণায়াম চারিপ্রকার এবং বিরামের প্রকৃতি অনুসারে উক্ত প্রকারভেদ স্বীকৃত। গভীরপ্রশ্বাসের পর বিরাম প্রথম প্রকার। দ্বিতীয় প্রকারে গভীর নিঃশ্বাসের পর বিরাম লইতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারে সযত্নে যথাক্রমে বাহিরে ও ভিতরে বায়ু ধারণ করা আবশ্যক; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারে বায়ুনিরোধের জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে হয় না। তৃতীয় প্রকারে শ্বাসগতি যে কোন সময়, সাধকের ইচ্ছামত হঠাৎ রুদ্ধ হয়। ইহাতে বিরাম দীর্ঘ হইবে, কিন্তু দৈহিক আয়াস থাকিবে না। চতুর্থ প্রকারে অনেক বার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের পর বিরাম লইতে হয়। প্রযত্ন-রাহিত্যই তৃতীয়ও চতুর্থ প্রকার প্রাণায়ামের বিশেষত্ব।

পরবর্তী যৌগিক সাহিত্যের ভাষায় প্রথম প্রকার প্রাণায়ামের নাম বাহ্য কুম্ভক, দ্বিতীয় প্রকারের নাম আভ্যন্তর কুম্ভক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের নাম কেবল কুম্ভক। প্রাণায়ামের তিনটি অংশ—রেচক, পূরক, ও কুম্ভক। অমৃতনাদ উপনিষদের দ্বাদশ শ্লোকে পূরক এই ভাবে বর্ণিত।—

বক্ত্রেণোৎপলনালেন তোয়মাকর্ষয়েৎ নরঃ।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্য পূরকস্যেতি লক্ষণম্॥

অনুবাদ—পদ্মনালের দ্বারা মুখে যেমন জল টানিয়া লওয়া যায় সেইরূপ ধীরে ধীরে নাসিকায় বায়ু আকর্ষণকেই পূরক বলে।

অমৃতনাদ উপনিষদের ১১ শ্লোকে রেচক এইভাবে ব্যাখ্যাত।—

উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশে শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকম্।
শূন্যভাবে নিযুঞ্জীয়াৎ রেচকস্যেতি লক্ষণম্॥

অনুবাদ—বহিরাকাশে বায়ু উৎসর্জন দ্বারা ফুস্‌ফুসকে বায়ুশূন্য করিয়া শূন্যভাবে অবস্থানকেই রেচকের লক্ষণ বলে।

উক্ত উপনিষদের ১৫ শ্লোকে কুম্ভকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়।—

নোৎশ্বসেৎ ন চ নিশ্বসেৎ নৈব গাত্রাণি চালয়েৎ।
এবং ভাবং নিযুঞ্জীয়াৎ কুম্ভকস্যেতি লক্ষণম্॥

অনুবাদ—নিঃশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে না; অথবা গাত্রচালন করিবে না। এই ভাবে অচল অবস্থানই কুম্ভকের লক্ষণ।

কেবল কুম্ভক স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম নামে অভিহিত। যোগশাস্ত্রে কেবল কুম্ভকের এই বর্ণনা পাওয়া যায়।—

রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যৎ বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তং স বৈ কেবল কুম্ভকঃ॥

অনুবাদ—রেচক ও পূরক ত্যাগ করিয়া সুখে যে বায়ুধারণ হয় সেই প্রাণায়ামকে কেবল কুম্ভক বলে।

কিছুক্ষণ নিয়মিত ভাবে নিঃশ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাসত্যাগ করিবার পর যে কোন সময় সুবিধামত বায়ুরোধ করিলে কেবল কুম্ভক হয়।

ইহাতে রেচক আট বার এবং পূরকে চার এবং কুম্ভকে ষোল বার মনে মনে ওঁ জপ করিতে হয়। বশিষ্ঠ সংহিতায় কেবল কুম্ভকের ফল এই ভাবে বর্ণিত।—

কেবলে কুম্ভক সিদ্ধে রেচপূরক-বর্জিতে।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥

অনুবাদ—রেচকবর্জিত ও পূরকরহিত কেবল কুম্ভক অভ্যাসে যিনি সিদ্ধ হন ত্রিভুবনে তাঁহার কিছুই দুর্লভ থাকে না।

শিবসংহিতায় (৩।৬২) উক্ত কুম্ভক সম্বন্ধে এইটি শ্লোক আছে।

ততোঽভ্যাস ক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনঃ স্বেপ্সিতা ধ্রুবম্ ॥

অনুবাদ—উপরোক্ত প্রকারে কেবল কুম্ভক অভ্যাসের ফলে তিন ঘটিকা (সওয়া ঘণ্টা) পর্য্যন্ত বায়ুরোধ করা যায়। ইহার দ্বারা যোগী নিশ্চিতই সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

'হঠযোগ প্রদীপিকা' হঠযোগের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য পুস্তক। উহার রচয়িতা স্বাত্মারাম সূরী আট প্রকার কুম্ভক উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাণায়ামের অন্য নাম কুম্ভক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রাণামামের প্রকারভেদ বিষয়ে পতঞ্জলির অভিমত তিনি গ্রহণ করেন নাই। পতঞ্জলির মতে কুম্ভকের প্রকৃতি অনুসারে প্রাণয়ামের প্রকার ভিন্ন হয়। কিন্তু স্বাত্মারাম সূরী নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রভৃতি ভেদে কুম্ভক-ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তৎপ্রদর্শিত আট প্রকার কুম্ভকের অভ্যাস কৌশল অভিন্ন ; কিন্তু প্রত্যেক প্রকারে রেচক ও পূরকের পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

স্বাত্মারাম সূরীর মতে আট প্রকার প্রাণায়ামের নাম—সূর্য্যভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা এবং প্লাবিনী। উজ্জায়ী ও ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম পরে বিশদভাবে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। সূর্য্যভেদন প্রাণায়াম এই ভাবে করিতে হয়—পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে বা স্বস্তিকাসনে বসিয়া সমকায়শীরোগ্রীব হইয়া ডান নাক দিয়া বায়ু পূরক করুন এবং যতক্ষণ সম্ভব বায়ু কুম্ভক করিয়া ধীরে ধীরে ডান নাক দিয়াই বায়ু রেচক করুন। প্রথমে দশ হইতে বিশ বার প্রত্যহ এইরূপ করিবেন এবং পরে ক্রমশঃ উহার সংখ্যা বাড়াইবেন। ইহার দ্বারা দেহে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং শীত বা বর্ষা ঋতুতে সূর্য্যভেদন প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। ইহা দেহে পিত্ত বৃদ্ধি করে ; কিন্তু সর্ব প্রকার মাথার রোগ ও অন্যান্য রোগ আরোগ্য করে।

সীৎকারী প্রাণায়াম এই ভাবে করিতে হয়। পূর্ববৎ কোন ধ্যানাসনে উপবেশন করিয়া দুই দন্তপংক্তির মধ্য দিয়া জিহ্বা বাড়াইয়া ওষ্ঠদ্বয়ে লাগান এবং দুগ্ধ পানের সময় ওষ্ঠদ্বয় যেভাবে প্রসারিত করিতে হয় সেইভাবে করুন এবং নাসাদ্বয় বন্ধ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের সাহায্যে বায়ু তালে তালে পূরক করুন এবং যতক্ষণ সম্ভব কুম্ভক করিয়া ধীরে ধীরে নাসাদ্বয় দিয়া বায়ু রেচন করুন। কোন প্রকার পৈশিক সঙ্কোচন এই প্রাণায়ামে অনাবশ্যক। সীৎকারীর দ্বারা দেহ শীতল হয় বলিয়া ইহা গ্রীষ্ম ঋতুতে অভ্যাস করা উচিত। ইহা জ্বরাদিজনিত সকল প্রকার তাপবৃদ্ধি রোধ এবং নানা রোগ নাশ করে। পানাহারের লোলুপতা নিদ্রালুতা আলস্যাদি এই প্রাণায়াম অভ্যাসে অন্তর্হিত হয়। সকালে একশত বার এবং সন্ধ্যায় ৩৩ বার এই প্রাণায়াম তিন বৎসর পর্যন্ত করিলে জরা বাধিত ও যৌবন দীর্ঘ কাল

রক্ষিত হয়। যাহারা এই প্রাণায়াম নিয়মিত অভ্যাস করেন তাহাদের দেহে কোন প্রকার উগ্র বিষ অনিষ্টকর ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রবাদ আছে, কাকভূষণ্ডী উক্ত প্রাণায়ামে সিদ্ধ ছিল।

ঘেরণ্ড সংহিতায় (৫।৭২) শীতলী প্রাণায়ামের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত।—

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েৎ শনৈঃ।
ক্ষণং চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাম্ রেচয়েৎ পুনঃ॥

অনুবাদ—কাকচঞ্চুবৎ জিহ্বাকে ওষ্ঠদ্বয়ের বাহিরে এক আঙ্গুল আনিয়া ও নাসাদ্বয় বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে জিহ্বার দ্বারা বায়ু গ্রহণ-পূর্বক উদরে প্রেরণ করুন এবং কিছুক্ষণ কুম্ভকান্তে নাসাদ্বয় দ্বারা পুনরায় বায়ু রেচন করুন। রেচন কালে মুখ বন্ধ থাকিবে এবং বায়ু গ্রহণান্তে ঢোক গিলিয়া বায়ু উদরে টানিয়া লইবেন। প্রথমে রোজ দশ হইতে বিশ বার শীতলী প্রাণায়াম অভ্যাস করুন এবং পরে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিবেন। কেহ কেহ অন্ততঃ পাঁচ হইতে সাত মিনিট পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন বার ইহা অভ্যাস করেন। শীতলী প্রাণায়াম অভ্যাসে দেহ শীতল হয়। কফপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অভ্যাস করা উচিত নয়। যখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে তখন ইহা অভ্যাস করিবেন না। ইহার ফলে দেহ কামদেবের মত সুশ্রী হয়। শিবসংহিতায় (৩।৯০) শীতলীর সুফল এই ভাবে বর্ণিত।—

অহর্নিশং পিবেৎ যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য রোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ।
দূরশ্রুতিঃ দূরদৃষ্টিঃ তথা স্যাৎ দর্শনং খলু॥

অনুবাদ—যে যোগী দিবারাত্রি কাকচঞ্চুর দ্বারা প্রাণবায়ু পান করেন তাহার সর্বরোগ বিনষ্ট হয়। তাহার দূরদৃষ্টি এবং দূরশ্রবণ শক্তিলাভ হয় এবং তাঁহার সুসূক্ষ্ম অনুভূতি জন্মে।

মূর্চ্ছা প্রাণায়াম ষন্মুখী মুদ্রা নামেও অভিহিত। ইহা এই ভাবে করিতে হয়। সিদ্ধাসনে বসিয়া জালন্ধর বন্ধ করিয়া দুই নাক দিয়া বায়ু পূরণ করুন। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কর্ণদ্বয়ের উপর, তর্জনীদ্বয় চক্ষুদ্বয়ের উপর, মধ্যমা ও অনামিকা নাসাদ্বয়ের উপর এবং কনিষ্ঠাদ্বয় মুখের উপর রাখুন এবং ছয় সেকেণ্ড কুম্ভক করুন। মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিসমূহ শিথিল করিয়া ধীরে ধীরে উভয় নাসা দিয়া বায়ু রেচন করুন। তখনও জালন্ধর বন্ধ থাকিবে। অন্য প্রকারেও মূর্চ্ছা প্রাণায়াম করা যায়। পূর্ববৎ একই আসনে বসিয়া মূল-বন্ধ ও জালন্ধর-বন্ধ যুগপৎ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাখিবেন। তৎপরে বাম নাসা দ্বারা পূরক, কিছুক্ষণ কুম্ভক ও ডান নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবেন। এই প্রাণায়াম দ্বারা ফুসফুসের বায়ু ধারণের শক্তি বৃদ্ধি হয়। কুম্ভক বেশী করিলে জালন্ধর বন্ধের পরিবর্তে উড্ডীয়ান বন্ধ করিবেন। চক্ষুদ্বয় স্তিমিত ও দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ করিলে পঞ্চভূতের পঞ্চ তত্ত্বের পঞ্চবর্ণ দৃষ্টি হয়। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ পীত, জলতত্ত্বের বর্ণ শ্বেত, অগ্নিতত্ত্বের বর্ণ রক্ত, বায়ুতত্ত্বের বর্ণ সবুজ এবং ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ নীল। মূর্চ্ছা প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয় এবং মানসিক একাগ্রতা বাড়ে।

ভ্রামরী প্রাণায়ামে পূরকের সময় ভ্রমর ধ্বনিবৎ শব্দ হয়। এই ভাবে ভ্রামরী প্রাণায়াম করিবেন। সিদ্ধাসনে বসিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত রাখিয়া ভ্রূযুগল মধ্যে মন একাগ্র করিয়া জালন্ধর বন্ধ করুন। ভ্রমরবৎ শব্দ করিতে করিতে নাসাদ্বয় দিয়া বায়ু পূরক করুন। তিন

সেকেণ্ড মাত্র বায়ু পূরক করিয়া ভ্রমরবৎ শব্দ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করুন। একশত চুয়াল্লিশ (১৪৪) বার এই প্রাণায়াম অভ্যাস করা যায়। ইহার ফলে অনাহত ধ্বনি শ্রুত হয় এবং মন সংযত হয়। অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষকের নিকট প্রাণায়াম-রহস্য শিক্ষা করা উচিত। প্লাবিনী প্রাণায়াম এইরূপে করিতে হয়। পদ্মাসনে বসিয়া হস্তদ্বয় সরল ভাবে ঊর্ধে প্রসারিত করুন। নাসাদ্বয় দিয়া বায়ু পূরক করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন এবং বাহুদ্বয় সংযুক্ত ভাবে বালিশের মত মাথার নীচে রাখুন। যতক্ষণ কুম্ভক করিবেন ততক্ষণ ভাবিবেন, "আমার দেহ পালকের মত লঘু"। পুনরায় পূর্ববৎ পদ্মাসনে বসিয়া ধীরে ধীরে দুই নাসা দিয়া বায়ু রেচন করুন। দীর্ঘকাল এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে জলের উপর ভাসা বা বসা, এমন কি শূন্যে অবস্থানও সম্ভব হয়।

প্রাণায়ামের উপকারিতা যোগদর্শনের (২।৫২-৫৩) এই সূত্রদ্বয়ে বিবৃত।—ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং ধারণাসু চ যোগ্যতা বর্ধতে মনসঃ।" ইহার অর্থ, প্রাণায়ামে জ্ঞানের আবরণ ক্ষীণ হয় এবং মনের ধারণাশক্তি বাড়ে। ব্যাসদেব উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ। ততো বিশুদ্ধির্মলনাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য।" ইহার অর্থ, প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই। ইহাতে মনোমল বিনষ্ট এবং জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়।

শিব সংহিতায় (৩।৪৮-৪৯) প্রাণায়ামের উপকারিতা এইরূপে বর্ণিত আছে।—

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দনং কারয়েৎ সুধীঃ॥
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥

অনুবাদ—প্রাণায়াম প্রথম অভ্যাসের ফলে শরীরে স্বেদ (ঘর্ম) নির্গত হয়। যখন ঘাম হয় তখন উহা গাত্রে মর্দন করিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ যোগীর দেহে সপ্ত ধাতু নিস্তেজ হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফল শিব সংহিতায় (৩।৫০) এইরূপে উল্লিখিত।

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোধিকতরাভ্যাসৎ গগনে চরসাধকঃ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় অবস্থায় দেহ কম্পিত হয় এবং অধিকতর অভ্যাসের ফলে সাধক ভেকবৎ ভূমি হইতে উত্থিত হইতে পারেন এবং আবার ভূমিতে নামিয়া আসিতে সমর্থ হন।

শিবসংহিতায় (৩।৫১) আছে।

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ততে।
বায়ুসিদ্ধস্তদাজ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী।

অনুবাদ। পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া যোগী যখন ভূমি ছাড়িয়া শূন্যে অবস্থান করেন তখন তাহার বায়ুসিদ্ধি অর্থাৎ প্রাণজয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়।

প্রাণায়ামের তিনটি অংশ থাকিলেও পতঞ্জলি বা ব্যাসদেব কর্তৃক কুম্ভকার্থেই প্রাণায়াম শব্দ ব্যবহৃত। পতঞ্জলি স্বয়ং পূরক ও রেচক শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। কুম্ভকের পরিবর্তে প্রচ্ছর্দন শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যাসের মতে প্রচ্ছর্দন শব্দের অর্থ ফুসফুস হইতে বলপূর্বক বায়ুরেচন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে পূরকের কোন প্রতিশব্দ দৃষ্ট হয় না। উহার দ্বিতীয় পাদের ৪৯ সূত্রে তিনি যে শ্বাস-

প্রশ্বাস শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের অর্থ যথাক্রমে গৃহীত বায়ু ও পরিত্যক্ত বায়ু; পূরক ও রেচক নহে। কারণ, পূরক বা রেচক ক্রিয়ামাত্র। আভ্যন্তর প্রাণায়াম বর্ণনাকালে তিনি অবশ্য পূরক ক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যোগসূত্রে পূরক শব্দ বা উহার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তাঁহার মতে প্রাণায়াম বা বিধারণই কুম্ভক এবং প্রচ্ছর্দনই রেচক।

এখন আমরা কুম্ভক, পূরক ও রেচকের পরিমাণকালাদি আলোচনা করিব। প্রাচীন কালেব যোগিগণ এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াছেন। কালমাত্রা বা দেশমাত্রার সহায়ে তাঁহারা ক্রিয়াত্রয় পরিমাপ করিতেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদেব সময়ে ঘড়ি বা কোন সূক্ষ্ম কাল পরিমাপক যন্ত্র ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে কাল-মাত্রা নির্ধারণ করিতেন। উক্ত মাত্রা নিম্নোক্ত পঞ্চ প্রকারে পরিমিত হইত। (১) চোখের পলক ফেলিতে (২) বা একটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে (৩) বা একবার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস লইতে (৪) বা ওঁ উচ্চারণ করিতে (৫) বা হাঁটুর চারি দিকে হাত ঘুরাইয়া তিন বার স্পর্শান্তে একবার তালি দিতে যত সময় লাগে তাহাকে কাল-মাত্রা বলা হয়। কালমাত্রার পরিমাণ প্রায় দেড় সেকেণ্ড। সম্ভবতঃ উপরোক্ত পাঁচ প্রকার কাল-মাত্রা বিভিন্ন যোগী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। এই সকল গণনা খুব নির্দিষ্ট না হইলেও বা উহাদের মধ্যে ঐক্য না থাকিলেও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। কারণ, প্রত্যেক শিষ্য গুরুর কাছে বসিয়া প্রাণায়াম শিক্ষা করিতেন। আধুনিক যোগ-সাধককে উক্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়।

তিনি এক সেকেণ্ড অন্তর এক দুই তিন ইত্যাদি অভ্যাস করিবেন। ঘড়ি ধরিয়া কয়েক মিনিট অভ্যাস করিলেই কাল-মাত্রার জ্ঞানলাভ হইবে। যাহারা ইচ্ছা করেন তাহারা প্রত্যেক সংখ্যার পূর্বে ওঁ যোগ করিয়া এই ভাবে জপ করিলেন—ওঁ ১, ওঁ ২, ওঁ ৩ ইত্যাদি।

কালমাত্রার ন্যায় দেশমাত্রার জ্ঞানও বিশেষ প্রয়োজন। কত জোরে পূরক বা রেচক অভ্যাস করিতে হইবে, ইহার পরিমাপের জন্য দেশমাত্রা (space unit) আবশ্যক। খুব জোরে রেচন করিলে নাসিকা হইতে অনেক দূরে বহির্গত বায়ুর স্রোত অনুভব করা যায়। রেচন যত জোরে হয় বায়ু-স্রোতের দীর্ঘতা তত বেশী হয়। নাকের সম্মুখে তুলা বা তদ্রূপ হালকা জিনিষ ধরিলে বায়ুস্রোতের দীর্ঘতা পরিমিত হয়। সাধারণতঃ প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য বার আঙ্গুল। কালমাত্রার দিকে মনোযোগ দিলেই দেশমাত্রা স্বতঃই রক্ষিত হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পূরকের মাত্রা সর্বদা রেচকের মাত্রার অর্ধেক হইবে এবং পূরক বা রেচকে শ্বাসগতি সমবেগে চলিবে।

প্রত্যেক পূরক শান্ত ভাবে শেষ হইবে। অনেকে পুরকের সময় সমগ্র শরীরের পেশীগুলি সজোরে সঙ্কুচিত করিতে অভ্যস্ত। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শ্বাসযন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গের পৈশিক শক্তির প্রয়োগে এক বিন্দু বায়ু বেশী গ্রহণ করা যায় না। পূরক ও রেচকের ন্যায় কুম্ভকেও কালমাত্রা প্রযোজ্য। প্রাণায়ামের নির্দিষ্ট অবস্থায় যত বায়ু গৃহীত হয় তত বায়ু পরিত্যক্ত হয়। গৃহীত বায়ুর পরিমাণ দ্বারা গ্রাহকের প্রাণশক্তি পরিমিত হয়। মনে করুন, কেহ ৩৫০০ সি. সি. বায়ু পুরকে গ্রহণ করেন এবং তত বায়ু

রেচকে ত্যাগ করেন। যদি পূরক সমবেগে চলে এবং দশ সেকেণ্ড লাগে তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক সেকেণ্ডে ৩৫০ সি. সি. বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। কিন্তু যদি পূরক করিতে দশ সেকেণ্ডের পরিবর্তে পাঁচ সেকেণ্ড লাগে তবে প্রত্যেক সেকেণ্ডে ৫০০ সি. সি. বায়ু গৃহীত হয়। যদি একই সময়ের মধ্যে এই বায়ু গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ৩৫০ সি. সি. লইতে অধিক জোর লাগিবে। যদি পূরক করিতে ১৪ সেকেণ্ড লাগে তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে ২৫০ সি. সি. বায়ু গৃহীত হয়। ইহাতে পূর্বাপেক্ষা কম জোর আবশ্যক হয়। সুতরাং সাত বা দশ বা চৌদ্দ সেকেণ্ডের পূরকে যে জোর লাগে তাহার পার্থক্য হয় কালভেদে। পুরকের সময় যতই অল্প হয় বায়ুগ্রহণে ততই বেশী জোর লাগে। অতএব কাল নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বেগও নিয়ন্ত্রিত হয়। বেগ একবার নির্দিষ্ট হইলেই দেশমাত্রা অচিরে নির্দিষ্ট হয়। পরন্তু কালমাত্রা স্থির করিয়া পুরকের সমবেগ রক্ষা করিলে কালমাত্রা স্বতঃই নির্দিষ্ট হইয়া যায়। পুরকের ন্যায় রেচকেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পুরক, কুম্ভক ও রেচকের মাত্রা স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট হইলে আমাদের দেখা উচিত, প্রাণায়ামের এই তিনটি অংশের মধ্যে কি কাল সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রচলিত মতে পুরক একমাত্রা হইলে কুম্ভক চার মাত্রা ও রেচক দুই মাত্রা হয়। অন্য প্রবাদ অনুসারে অংশত্রয়ের অনুপাত ১ : ২ : ২ হয়। এইরূপ যদি পুরক ষোল মাত্রায় হয়, কুম্ভক চৌষট্টি মাত্রায় হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় মতে পুরক ষোল মাত্রায় হইলে কুম্ভক ও রেচক বত্রিশ মাত্রায় হইবে। আর একটি প্রবাদ আছে যে, পুরক, কুম্ভক ও রেচক সমান মাত্রায় হওয়া আবশ্যক।

একটি নির্দিষ্ট হইলেই অপর দুইটি তদনুযায়ী সহজে নিরূপিত হয়। প্রথমে কুম্ভকের মাত্রা স্থির হওয়া আবশ্যক। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দ্বিতীয় বিধিই সহজসাধ্য। তবে অভ্যাসের পথে অগ্রসর হইলে প্রথম বিধি অনুষ্ঠানে ভয়ের কোন কারণ নাই; কিন্তু একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যে কুম্ভকের সময় বায়ুধারণ আরামদায়ক হওয়া চাই। রেচক বা পুরক সম্বন্ধেও এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনীয়। প্রাণায়ামের তিনটি অংশই বিনা আয়াসে এবং সুখকর ভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। ঝাকুনি দিয়া বা জোর করিয়া বা দম আটকাইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস অতিশয় অনিষ্টকর।

স্বামী কুবলয়ানন্দ তাঁহার যোগ পরীক্ষাগারে বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রথম শিক্ষার্থী ও স্বাস্থ্যান্বেষিগণের পক্ষে পুরক ও রেচকের অনুপাত ১ঃ২ হওয়া উচিত। কুম্ভক অভ্যাস ব্যতীত স্বাস্থ্যান্বেষিগণ রেচক ও পুরকের দ্বারাই প্রাণায়ামের সুফল লাভ করিতে পারেন। কুম্ভক অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে আরম্ভ করা আবশ্যক। প্রযত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে কুম্ভকেও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। প্রাণায়ামের দৈর্ঘ্য স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে স্থির করা উচিত; কিন্তু সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। প্রাণায়ামে মন একাগ্রভাবে শ্বাসগতির অনুগামী থাকিবে। অনেক সময় মাত্রার সংখ্যা রাখিবার জন্য শ্বাসগতি হইতে মনোযোগ বিচলিত হয়। এমনভাবে মাত্রাসংখ্যা গণনা করিতে হইবে যাহাতে মনোযোগ না কমিয়া যায়।

পরবর্তী যৌগিক সাহিত্যে নাড়ীসমূহকে উচ্চ স্থান প্রদান করা

হইয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে বা উহার ব্যাসভাষ্যে নাড়ী শব্দ একবার মাত্র উল্লিখিত। যে যোগসূত্রে (৩।৩১) নাড়ী শব্দ পাওয়া যায় তাহা—"কূর্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম।" ব্যাসদেব উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বলেন, "কণ্ঠকূপের অধোদেশে বক্ষে কূর্মাকারা নাড়ীকে কূর্মনাড়ী বলে। ইহাতে মনঃসংযম করিলে গর্তমধ্যস্থ গোধিকা বা সর্পের মত স্থির পদ লাভ হয়।" অবশ্য এই নাড়ী অপেক্ষাকৃত অপ্রধান। মানব দেহস্থ নাড়ীর মোট সংখ্যা বিভিন্নরূপে নির্ধারিত। কাহারো মতে ইহাদের সংখ্যা বাহাত্তর হাজার (৭২০০০); আবার কাহারো মতে সাড়ে তিন লক্ষ (৩৫০০০০)। কঠোপনিষদে (২।৩।১৬) আছে।—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্‌ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

অনুবাদ—হৃদয়স্থ নাড়ীর সংখ্যা এক শত এক (১০১)। তন্মধ্যে একটি মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়াছে। ইহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী দিয়া জীবাত্মা প্রয়াণ করিলে আপেক্ষিক অমরত্ব লাভ হয়। অন্যান্য নাড়ীসমূহ বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত। সেই সকল নাড়ী মার্গে উৎক্রমণ হইলে পুনর্জন্ম করিতে হয়। সুষুম্নার অন্য নাম ব্রহ্মনাড়ী।

প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬) আছে।— 'অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যা দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রানি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি।" ইহার অর্থ, হৃদয়ে একশত এক (১০১) নাড়ী (প্রধান স্নায়ু) আছে। উহাদের প্রত্যেকটি হইতে এক শত শাখা নাড়ী প্রসৃত। প্রত্যেক শাখানাড়ী হইতে বাহাত্তর হাজার প্রশাখা নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল নাড়ীতে ব্যান বায়ু বিচরণশীল

সুতরাং মূল নাড়ী ১০১; শাখানাড়ী ১০১×১০০=১০১০০; প্রশাখা নাড়ী ১০১০০×৭২০০০=৭২০০০০০। অতএব উপনিষদ মতে মোট নাড়ীসংখ্যা ৭২৭২১০২০১ হয়। এই সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন।

ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। এই তিনটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না প্রধানতম। যাহারা বিজ্ঞানালোকে নাড়ীর আকারও সংস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মেজর বামনদাস বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৮ খ্রীঃ 'থিয়জফিষ্ট' (Theosophist) নামক ইংরাজি মাসিকে তিনি নাড়ীতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা মৌলিক ও সারগর্ভ। ইহাই বর্তমান সময়ে প্রথমতম প্রচেষ্টা। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Positive Science of the Ancient Hindus, স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং বোম্বাইয়ের ডাঃ ভি. জি. রিলের Mysterious Kundalini পুস্তকত্রয়ে নাড়ী-বিজ্ঞান নূতন ভাবে আলোচিত। কিন্তু ইহাদের অভিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরীক্ষিত না হওয়ায় বিজ্ঞানসম্মত কিনা বলা যায় না।

আধুনিক শরীর-তত্ত্বের আলোকে নাড়ীকে স্নায়ু (nerve) বলা যাইতে পারে। স্বামী কুবলয়ানন্দ উক্ত মতের সমর্থক। শিব সংহিতায় (২।১৭) আছে—"নাড্যস্তু তা অধোবক্ত্রাঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য....।" ইহার অর্থ এই সকল নাড়ী পদ্মতন্তুবৎ সূক্ষ্ম এবং মেরুদণ্ড আশ্রয়পূর্বক অধোমুখে বিস্তৃত। সুতরাং শিবসংহিতায় বর্ণনা অনুসারে নাড়ীকে স্নায়ু বলাই যুক্তিসঙ্গত। ঈড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না মেরুদণ্ডেই অবস্থিত। ডাঃ রিলের মতে ঈড়া ও পিঙ্গলা দুই

নাড়ী মেরুদণ্ডের উভয় দিকে অবস্থিত sympathetic systemএর gangliated cord। স্বামী কুবলয়ানন্দ উক্ত মত অনেকাংশে সমর্থন করেন।

ঈড়া ও পিঙ্গলা মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া যথাক্রমে বাম নাক ও ডান নাকে সমাপ্ত। পিঙ্গলাকে সূর্য্য-নাড়ী বলে। পিঙ্গলাদ্বারে অর্থাৎ ডান নাক দিয়া যখন নিঃশ্বাস চলে তখন শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ঈড়াপথে অর্থাৎ বাম নাকে শ্বাসগতি হয় তখন শরীর শীতল থাকে। এইজন্য রাত্রে ডান নাকে এবং দিনে বামনাকে নিঃশ্বাস বহা স্বাস্থ্যকর। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক বা শ্রমসাধ্য কর্মকালে ডান নাকে নিঃশ্বাস বহা ভাল। লেখাপড়া প্রভৃতির সময় বাম নাকে নিঃশ্বাস চলা উচিত। যখন উভয় নাকে নিঃশ্বাস চলে তখন সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত হয়। সকালে বা সন্ধ্যায় সাধারণতঃ ত্রইরূপ নিঃশ্বাস চলে। তখন উপাসনাদি শুভ কর্ম প্রশস্ত। অধিকাংশ লোকের সুষুম্নার দ্বার বন্ধ থাকে। সুযুম্নার দ্বার উন্মুক্ত করাই প্রাণায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। পিঙ্গলার শ্বাস দীর্ঘ ও দ্রুত, ঈড়ার শ্বাস অপেক্ষাকৃত অদীর্ঘ ও অদ্রুত এবং সুষুম্নার শ্বাস অতি ধীরগামী। ঈড়া নাড়ীকে চন্দ্র-নাড়ী বলা হয়।

সুষুম্নার মধ্যে ষট্‌চক্র অবস্থিত। উহার অগ্রে ও পশ্চাতে গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা নাড়ীদ্বয় উৎপন্ন হইয়া বাম ও ডান চক্ষু অভিমুখে প্রসারিত। পূষা এবং যশস্বিনী নাড়ীদ্বয় মূলাধার হইতে বহির্গত এবং বাম ও ডান কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

অলম্বুষা ও শুভা এবং কৌশিকী নাড়ীত্রয় একই চক্রে জাত হইয়া যথাক্রমে বাহুমূল, লিঙ্গাগ্র ও পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিশিখী ব্রাহ্মণ এবং যোগচূড়ামণি উপনিষদ্‌দ্বয়ে বহু নাড়ীর নাম উল্লিখিত আছে।

পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিৎ ও বৈজ্ঞানিক প্রাণায়ামের অক্সিজেন মূল্য (oxygen value) নির্ধারণে সচেষ্ট ; কিন্তু যোগশাস্ত্র মতে ইহাতে স্নায়ুপুষ্টি (nerve culture) সমধিক হয়। প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কে এবং অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্র মেরুদণ্ডে অবস্থিত। মেরুদণ্ড বত্রিশখানি অস্থিখণ্ডের সমষ্টি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ছয় খানি অস্থি অন্যান্য খণ্ডের সহিত মিলিত হওয়ায় ২৬ খানি অস্থি দেখা যায়। তন্মধ্যে ৭ খানি ঘাড়ে, ১২ খানি পীঠে, ৫ খানি কোমরে এবং তন্নিম্নে ২ খানি অস্থি অবস্থিত। মস্তিষ্কে বার জোড়া এবং মেরুদণ্ডে একত্রিশ জোড়া প্রধান স্নায়ু বিদ্যমান। প্রধানতঃ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী এবং অস্থিখণ্ড যুগলের সন্ধিস্থলসমূহ হইতে বহির্গত। যেগুলিকে যোগশাস্ত্রে ষট্‌চক্র বলা হয় সেগুলি সম্ভবতঃ প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় মূলাধার চক্র হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত। ত্রিশিখী ব্রাহ্মণ উপনিষদের মতে সুষুম্না নাড়ী 'পদ্মসূত্র প্রতীকাশা' এবং 'বিদ্যুদা ভাসনালক'। একটী কেশকে শত ভাগে বিভক্ত করিবার পর প্রত্যেক ভাগকে পুনরায় এক শত ভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয় প্রত্যেক নাড়ী তত সূক্ষ্ম। নাড়ীর সূক্ষ্মতা যোগশাস্ত্রে উক্তরূপে বর্ণিত। এই স্নায়ু-জালই সমগ্র দেহে সংযোগ বিধান করে। প্রাণায়ামে স্নায়ুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়।

যেখানে নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয় তথায় প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। খুব ঠাণ্ডা বাতাসে বসা অনুচিত। ছাদের উপর বা নদীর ধারে বা কোন উন্মুক্ত স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস অতিশয় স্বাস্থ্যকর। গীতোক্ত 'চেলাজিনকুশোত্তর' আসনই প্রশস্ত। ভূতলোপরি কুশাসন, এবং তদুপরি মৃগচর্ম ও মোটা কাপড় পাতিলে উত্তম যোগাসন

প্রস্তুত হয়। চর্মাসন ব্যবহারে আপত্তি থাকিলে মোটা গালিচা আসন ব্যবহার্য্য। এইরূপ শাস্ত্রীয় আসনে বসিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাসকালে যে বিমল আনন্দ অনুভূত হয় তাহা অপার্থিব। তখন যোগাসন সম্রাটের সিংহাসন অপেক্ষা লোভনীয় মনে হয়; কিন্তু স্বাস্থ্য লাভার্থ অভ্যাসকারী বসিয়া বা দাঁড়াইয়া উজ্জায়ী প্রাণায়াম করিতে পারেন। চলমান ব্যক্তিও উজ্জায়ী প্রাণায়াম অভ্যাসে সমর্থ। হঠযোগ প্রদীপিকায় (২।৫২) আছে-"গচ্ছতা তিষ্ঠতা কার্য্যম্ উজ্জায়াখ্যম্ তু কুম্ভকম্।" ইহার অর্থ, দণ্ডায়মান বা চলমান অবস্থায় উজ্জায়ী প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে আসনের প্রশ্ন উঠে না। দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস কালে মেরুদণ্ড উন্নত ও হস্তদ্বয় দুই কোমরে বিন্যস্ত থাকিবে। বসিয়া প্রাণায়াম করিলেও কোন ধ্যানাসনের প্রয়োজন নাই। যে কোন ভাবে সমকায় শীরোগ্রীব হইয়া বসিয়া হস্তদ্বয় হাঁটু দুইটীর উপর রাখিবেন অবশ্য সিদ্ধাসনে বা পদ্মাসনে কিংবা স্বস্তিকাসনে বা সমাসনে বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস সর্বপেক্ষা নিরাপদ ও উপকারী।

স্বস্তিকাসনে বা সমাসনে বসিলে জ্ঞানমুদ্রা করিতে হয়। প্রসারিত হস্তদ্বয় স্ব স্ব হাঁটুর উপর বিন্যস্ত রাখিয়া তর্জনী বাঁকাইয়া অঙ্গুষ্ঠে লাগাইলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। কুম্ভক করিবার সময় জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস কর্তব্য। কুম্ভকের সহিত জালন্ধর বন্ধ বা উড্ডীয়ান বন্ধ অভ্যাস সাধকের ইচ্ছাধীন। কোন অভিজ্ঞ গুরুর সাহায্য ব্যতীত কুম্ভকের সহিত বন্ধত্রয় যুগপৎ অভ্যাস অনিষ্টজনক হইবার সমধিক সম্ভাবনা। স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে পূর্ণ আহারের সাড়ে চার ঘণ্টা পরে বা আহারের আধ ঘণ্টা পূর্বে প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রকৃষ্ট সময়।

অল্পাহারের অন্তত দুই ঘণ্টা পরে প্রাণায়াম করা যায়। শিব সংহিতায় (৩ ৪৪) আছে।

সদ্যো ভুক্তোঽপি ক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
অভ্যাসকালে প্রথমঃ কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্য ভোজনম্॥

অনুবাদ— সদ্য ভোজনের পরে বা ক্ষুধাকালে বিবেকিগণ প্রাণায়াম করিবেন না। প্রথমতঃ অভ্যাসের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বা ঘৃত পান বিধেয়।

স্বাস্থ্যকামী সকালে ও সন্ধ্যায় রোজ দুইবার প্রাণায়াম করিবেন। প্রত্যহ একবার প্রাণায়াম করিলে প্রাতঃকালই প্রশস্ত। মুমুক্ষও প্রথমে দিনে দুইবার প্রাণায়াম করিবেন। অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে দ্বিপ্রহরে, মধ্যাহ্নে বা মহানিশায়ও প্রাণায়াম করা যায়। শিব সংহিতায় আছে (৩.২৭)—

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সুর্য্যাস্তে চার্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্বারং কালেষ্যেতেষু কুম্ভকান্॥

অনুবাদ—মুমুক্ষু প্রত্যহ চার বার—প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সুর্য্যাস্তে ও মধ্যরাত্রে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন।

মুমুক্ষুর একাহারী হওয়া আবশ্যক। আহারের অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা পরে শূন্য উদরে তিনি প্রাণায়াম অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন। স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে প্রত্যহ যোগাসন অভ্যাসের পরে স্বাস্থ্যকামী প্রাণায়াম করিবেন। তবে সাধকের শ্রমসাধ্য (violent) ব্যায়ামের পরে প্রাণায়াম অভ্যাস অনুচিত। প্রাণায়াম বা আসনাভ্যাসে সাত বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে কোন পুরুষ বা নারীর

অধিকার আছে। চল্লিশ বৎসরের পরে অভ্যাস করিতে হইলে অভিজ্ঞের পরামর্শ লইবেন। এই পুস্তকে প্রদত্ত বিধিসমূহ পালন করিলে আসন বা প্রাণায়াম অভ্যাসে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সাবধানতার সহিত ও বিধিপূর্বক অভ্যাস করিলে আসন ও প্রাণায়ামের সুফল অচিরে প্রত্যক্ষীভূত হ'ব।

উজ্জায়ী প্রাণায়াম

আট প্রকার প্রাণায়ামের মধ্যে উজ্জায়ী অন্যতম। উজ্জায়ী= উদ্+জায়ী। এই শব্দের মুলার্থ উচ্চ শব্দ। প্রাচীন ভারতে আত্মীয়-বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎকালে আনন্দ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উচ্চ স্বরে জয় বলা হইত। উজ্জায়ী প্রাণায়ামে নাসারন্ধ্র আংশিক বন্ধ হওয়ায় উচ্চ শব্দ সৃষ্ট হয় বলিয়া সম্ভবতঃ উক্ত নামকরণ হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে এই প্রাণায়ামে সিদ্ধিমার্গ সুগম হয়। এইজন্য ইহার নাম উজ্জায়ী। হঠযোগ প্রদীপিকার টীকাকার ব্রহ্মানন্দ উজ্জায়ী শব্দের পরিবর্তে উজ্জাপী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। উজ্জায়ীর শব্দার্থ অস্পষ্ট প্রতীত হওয়ায় সম্ভবতঃ তিনি উক্ত শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ পূবক অভ্যাস কালে একটি নাক বন্ধ রাখিতে হয় এবং কুম্ভকের সময় উভয় নাক বন্ধ থাকে। নাক বন্ধ করিবার যে প্রথা প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত তাহা সুখকর এবং বৈজ্ঞানিক। ডান হাত বিস্তৃত করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা বাঁকাইয়া

অঙ্গুষ্ঠমূলে লাগাইতে হয়। বক্র অঙ্গুলীদ্বয় ব্যতীত অন্য তিনটি অঙ্গুলী প্রসারিত থাকে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ডান নাকের উপর এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা বাম নাকের উপর ন্যস্ত হয়। তৎপূর্বে অঙ্গুলীত্রয় নাসিকার সেতুপরি থাকে। যখন ডান বা বাম কিংবা উভয় নাক বন্ধ করিবার আবশ্যক হয় তখন যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠ বা অনামিকা এবং কনিষ্ঠা বা তিনটি অঙ্গুলী নামিয়া নাসারন্ধ্র দ্বয়ের উপরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। নাসিকা বন্ধ করিবার আবশ্যকতা না থাকিলে ডান হাত নামাইয়া ডান হাঁটুর উপরে ন্যস্ত করিবেন।

প্রথম হইতে প্রত্যেক পূরক পূর্ণ প্রশ্বাসের পরে লইতে হয়। উজ্জায়ী প্রাণায়ামে দুই নাক দিয়া পূরক করা বিধেয়। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে বক্ষঃস্থল ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইবে এবং বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিবে। বায়ু গ্রহণের সময় গলদেশস্থ নাসারন্ধ্র (glottis) আংশিক বন্ধ থাকে। সেইজন্য উজ্জায়ী প্রাণায়ামে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্নার মত অবিরত শব্দ হয়, কিন্তু উক্ত প্রকার কান্নার শব্দ অবছিন্ন ও আকস্মিক। আর উজ্জায়ীতে সেই শব্দ নিরবচ্ছিন্ন। গলদেশ ও নাসাপথের সন্ধিস্থলে বায়ুর ঘর্ষণ হেতু উক্ত শব্দ উৎপন্ন হয় পূরকের সময় মুখের বা নাকের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইবে না। অনেকের নাসিকা নিঃশ্বাস গ্রহণকালে বিকৃত ও কুঞ্চিত হইয়া উঠে। ইহা অনাবশ্যক, এমন কি অনিষ্টকর। পূরকের সময় তলপেটের পেশী-গুলি সামান্য সঙ্কুচিত হইবে। পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিৎগণ নিঃশ্বাস গ্রহণ-কালে তলপেট প্রসারিত রাখিতে পরামর্শ দেন। স্বামী কুবলয়ানন্দ বলেন, শ্বাসতত্ত্বের অজ্ঞতাহেতু তাহারা উক্ত পরামর্শ দেন। তাহারা মনে করেন তলপেট প্রসারিত থাকিলে অধিকতর পরিমাণ বিশুদ্ধ

বায়ু এবং তৎসঙ্গে অক্সিজেন ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিবে। স্বামী কুবলয়ানন্দ স্বীয় যৌগিক গবেষণাগারে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। ‘যোগমীমাংসা’ ত্রৈমাসিকের চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় ‘উজ্জায়ী প্রণায়াম ব্যাখ্যাত’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে প্রাণায়ামের প্রতিশব্দ গভীর শ্বাসক্রিয়া (deep breathing) হইতে পারে না। কারণ প্রথমটির ফল দ্বিতীয়টীর ফল অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য আমরা অধিকাংশ স্থলে প্রাণায়াম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। উজ্জায়ী প্রাণায়ামের নিঃশ্বাস বেগ সরল (smooth) ও সমভাবাপন্ন (uniform) এবং গলদেশের শব্দটি মধুর ও লঘু হওয়া আবশ্যক। নিঃশ্বাস পরিপূর্ণ হইলে অধিক বায়ু গ্রহণের প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ। কারণ কোনও পৈশিক প্রচেষ্টায় এক কিউবিক সেন্টিমিটার (সি সি) বায়ু গ্রহণ অসম্ভব। পূরক সমাপ্ত হইলেই কুম্ভক আরম্ভ করিবেন।

উজ্জায়ী প্রাণায়ামে আভ্যন্তর কুম্ভক হয় গভীর পূরকের পরে। অভ্যন্তরে বায়ুরোধ করাকে আভ্যন্তর কুম্ভক বলে। এই কুম্ভকের প্রথম প্রয়োজন আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র (glottis) একেবারে বন্ধ করা। ইহার দ্বারা ফুস্‌ফুসে বায়ু যাতায়াত বন্ধ হয়। দ্বিতীয় প্রয়োজন জালন্ধর বন্ধ এবং তৃতীয় প্রয়োজন নাসিকাদ্বয় রুদ্ধ করা। ফুস্‌ফুসে রুদ্ধ বায়ু বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে। নাসারন্ধ্র (glottis) খুলিয়া গেলেও জালন্ধর বন্ধ ও নাসাদ্বয় রুদ্ধ থাকায় বায়ু বহির্গত হইতে পারে না। তলপেটের কিঞ্চিৎ সংকোচনের সহিত বক্ষপ্রাচীর

ও উত্থিত পঞ্জর দৃঢ় থাকিলে কেবলমাত্র নাসারন্ধ্র (glottis) বন্ধ করিয়া বায়ুরোধ করা যায়; নাসাদ্বয় বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। যত বেশী কুম্ভক করা যায় তত বেশী অক্সিজেন রক্তে মিশ্রিত হয়—এই সাধারণ বিশ্বাস অমূলক। ইহা পরীক্ষাগারে প্রমাণিত ও ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কুম্ভকের কাল-মাত্রা দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে। প্রথমতঃ যতক্ষণ কুম্ভক থাকে ততক্ষণ শ্বাসকষ্টের (suffocation) পীড়াদায়ক ভাব আসিবে না। দ্বিতীয়তঃ কুম্ভকের শেষে ফুস্‌ফুস এমন আয়ত্তাধীন থাকিবে যাহাতে সহজ ও সমানুপাতিক রেচক সম্ভব হয়। পূরক ও কুম্ভকের কালের অনুপাতে ১ঃ৪ অথবা ১ঃ১ হইবে। প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিতীয় অনুপাত অনুসরণ নিরাপদ। কুম্ভকের শেষে নাসাদ্বয় খুলিয়া দিবেন এবং জালন্ধর বন্ধ ছাড়িবেন এবং নাসারন্ধ্র (glottis) কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিবেন। বক্ষঃস্থল শিথিল হইলেই রেচক আরম্ভ হয়।

বাম নাকে রেচক করিতে হয়। রেচক ধীরে ধীরে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত ফুসফুস আয়ত্তাধীন এবং নাসারন্ধ্র কিঞ্চিৎ বন্ধ থাকিবে। ঘর্ষণজাত শব্দও সমভাবে (uniformly) চলিবে। রেচকের আরম্ভ হইতেই তলপেটের পেশীগুলি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইবে। বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্রতম আকারে সঙ্কুচিত হইবার পরেও তলপেটের সংকোচন চলিতে থাকে। পরিশেষে অতিরিক্ত বায়ুর (supplemental air) সর্বশেষ সি. সি. বহির্গত হয়। রেচনকালেও কষ্টকর প্রচেষ্টা (strain) বর্জনীয়। অযথা প্রযত্ন অনাবশ্যক ও অস্বাস্থ্যকর। অবশ্য পূরক বা কুম্ভক অপেক্ষা রেচকে অনিষ্টের সম্ভাবনা আরও অল্প। পূরকে বা কুম্ভকে অযথা বা অধিক প্রযত্ন ফুস্‌ফুসের পক্ষে ক্ষতিকর এবং রেচকে তদ্রূপ

প্রচেষ্টা হৃৎপিণ্ডের অনিষ্টকর। সেইজন্য ফুস্‌ফুসের বা হৃৎপিণ্ডের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে উজ্জায়ী প্রাণায়াম অভ্যাসের পূর্বে অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

রেচকে পূরক অপেক্ষা অধিকতর সময় লাগে। প্রচলিত বিধিমতে পূরক ও রেচকের অনুপাত ১:২ হয়। উক্ত বিধিই সর্বদা অনুসরণীয়। রেচক এত দীর্ঘ হইবে না, যাহাতে পরবর্ত্তী পূরক দ্রুততর হয়। পূরক ও কুম্ভক ও রেচকের মাত্রা নির্ধারণের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, একটিমাত্র প্রাণায়াম নহে, একাসনে বসিয়া যৎ গুলি প্রাণায়াম অনুষ্ঠেয়, সবগুলিতেই যেন প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত শ্বাস কষ্ট না হয়। মনে করুন, এককালীন উপবেশনে চৌদ্দ বার উজ্জায়ী করিতে হইবে। প্রাণায়ামের অংশত্রয়ের মাত্রা এইরূপে নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক, যাহাতে শ্বাসকষ্ট শেষ পর্য্যন্ত আদৌ না হয়। শ্বাসকষ্ট ফুস্‌ফুসের ক্লান্তি কর। সেই অনুসারে প্রাণায়ামের মোট সংখ্যাও ধীরভাবে বিচারপূর্বক স্থির করা উচিত।

প্রত্যেকটি প্রাণায়ামের কাল কতক্ষণ হওয়া উচিত? এই কালের পরিমাণ ফুস্‌ফুসের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে ধর্মসাধক এবং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি যথাক্রমে কালের পরিমাণ দীর্ঘতর ও ক্ষুদ্রতর করিবেন। যে স্বাস্থ্যকামী প্রাণায়ামের অক্সিজেন মূল্যের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখেন তাহার পক্ষে মিনিটে চার বার মাত্র উজ্জায়ী করিলেই যথেষ্ট। স্বাস্থ্য লাভার্থ ইহার অধিক সংখ্যা নিষ্প্রয়োজন। পূরক, কুম্ভক বা রেচকের সময় যেখানে নিশ্বসিত বা প্রশ্বসিত বায়ুর প্রথম স্পর্শ অনুভূত হয় সেখানেই ধর্মসাধক মনঃ-সংযম করিবেন। নাসাপথে জিহ্বামূলে যেখানে ফ্যারিংশ অবস্থিত

তথায় বায়ুর প্রথম স্পর্শ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যান্বেষীর মন নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর উপর একাগ্র থাকিবে। পূরক কালে গৃহীত বায়ুর বা রেচককালে পরিত্যক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রে ঘর্ষিত হয়। তথায় পূরক ও রেচকের সময় মনঃসংযম কর্তব্য। কুম্ভকের সময় ফুস্‌ফুসে বায়ু রুদ্ধ থাকে। সুতরাং কুম্ভককালে স্বাস্থ্যকামী তথায় মনঃস্থির করিবেন।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কুম্ভকবর্জিত উজ্জায়ী প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিধেয়। ব্যায়ামবীর রামমূর্তি এবং তাহার শিষ্যগণের মত অলৌকিক পেশী-শক্তি লাভের উদ্দেশ্য না থাকিলে স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে কুম্ভক অনাবশ্যক। মুমুক্ষু সাধকও কিছু কাল অভ্যাসের পরে অতিশয় সর্তকতার সহিত কুম্ভক আরম্ভ করিতে পারেন। প্রথম শিক্ষার্থী উজ্জায়ী অভ্যাসকালে দুই নাকে রেচক করিবেন। এই মত প্রচলিত বিধির বিরোধী হইলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সমভাবে ফলপ্রদ। উজ্জায়ী কুম্ভকবর্জিত হইলে এবং দুই নাকে রেচক করিলে নাসাদ্বয় বন্ধ করিবার জন্য ডান হাত ব্যবহারের আর প্রয়োজন থাকে না।

প্রত্যহ উজ্জায়ী প্রাণায়াম কতবার অভ্যাস করা উচিত? ধর্ম-সাধকের পক্ষে ৩২০ উহার উর্ধতম সংখ্যা। এই সংখ্যা দৈনিক দুই বা চার উপবেশনে সাধকের সুবিধামত বিভক্ত হইবে। স্বাস্থ্যা-ন্বেষীর পক্ষে উর্ধতম ২৪০ বার অভ্যাসই যথেষ্ট। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় দুই উপবেশনে উক্ত সংখ্যক উজ্জায়ী অভ্যাস করিবেন। প্রথম শিক্ষার্থী প্রত্যেক উপবেশনে সাতবার হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহে তিনবার বাড়াইবেন। স্বামী কুবলয়ানন্দ বহু বৎসর যাবৎ

সহস্র সহস্র শিক্ষার্থীর পক্ষে উক্ত সংখ্যা সুবিধাজনক ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া দেখিয়াছেন। যাহার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল এবং হৃৎপিণ্ড বা ফুস্ফুস সবল তাহার পক্ষে এই বিধি উপকারী।

স্বামী কুবলয়ানন্দ উজ্জায়ী প্রাণায়ামের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন এখন তাহাই আমাদের আলোচ্য। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উজ্জায়ী প্রাণায়াম বসিয়া বা দাঁড়াইয়া এমন কি চলিতে চলিতেও অভ্যাস করা যায়। কাহারো কাহারো মতে শায়িত অবস্থায়ও উজ্জায়ী করা চলে। কিন্তু এই সকল বিধি স্বাস্থ্যান্বেষীর পক্ষেই প্রযোজ্য। মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে কোন ধ্যানাসনে উপবেশনই শ্রেয়স্কর। বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বা চলিতে চলিতে উজ্জায়ী করিলেও মেরুদণ্ড সরল ও উন্নত রাখা বাঞ্ছনীয়। মেরুদণ্ড উন্নত রাখিলে তিনটি উপকার হয়। প্রথমতঃ তলপেটের সঙ্কোচনের সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ দেহভার মেরুদণ্ডের উপর সর্বাপেক্ষা কম পড়ে। তৃতীয়তঃ স্বাস্থ্যকর শ্বাসগতির পক্ষে বক্ষঃস্থলের অবস্থান সুবিধাজনক হয়। ঘাড় বা পীঠ বাঁকাইয়া নত হইয়া বসিলে সরল শ্বাসগতি ব্যাহত হয়। কেহ কেহ বুক ফুলাইয়া ও মেরুদণ্ড পশ্চাতে বাঁকাইয়া বসেন। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক হইতে ইহা অনিষ্টকর। ইহাতে তলপেটের পেশীগুলি প্রসারিত থাকায় শ্বাসগতির সারল্য রক্ষিত হয় না। বসিয়া উজ্জায়ী করিলে হস্তদ্বয় স্ব স্ব হাঁটুর উপর, এবং দাঁড়াইয়া করিলে হ[illegible]র দুই কোমরের মোটা হাড়ের উপর ন্যস্ত হইবে। হস্তদ্বয় স্কন্ধ[illegible] হইতে ঝুলিয়া থাকা উচিত নহে। ইহাতে বুকের উপর অ[illegible]ঙ্গুত ভার পড়ে।

যে কোন প্রকার প্রাণায়াম অভ্যাসকালে এইটী লক্ষ্য রাখিতে

হইবে যে, বুক যেন সম্পূর্ণরূপে দেহভারমুক্ত থাকে। ইহার দ্বারা স্বাভাবিক শ্বাসগতি অব্যাহত ভাবে চলে। যিনি উজ্জায়ী অভ্যাস করেন তিনি হস্তদ্বয় লম্বিত রাখিয়া পরে উহাদিগকে কোমরে বা হাঁটুতে স্থাপন করিলে উভয় অবস্থানের পার্থক্য সহজে ধরিতে পারিবেন। প্রাণায়াম দীর্ঘ সময় চালাইলে লম্বমান হস্তদ্বয়ের ভার বিশেষভাবে অনুভূত হয়। প্রাণায়ামের অক্সিজেন-মূল্য ও স্নায়ুপুষ্টির দিক্‌দ্বয়ে সমান লক্ষ্য রাখিতে হইলে তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলির অবস্থাও সম্যক্ বিবেচ্য। নিশ্বাস ব্যায়ামের অক্সিজেন-মূল্যের দিকে লক্ষ্য দিয়া পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিৎগণ বলেন যে, তলপেটের পেশীগুলি শিথিল ও প্রসারিত থাকাই ভাল; কারণ তাহাদের মতে ইহার দ্বারা বক্ষঃস্থলের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং অধিকতর পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ সম্ভব হয়। তাহারা আরও বলেন যে, তলপেট সঙ্কুচিত থাকিলে ডায়াফ্রামের অবতরণ ব্যাহত হয় এবং তজ্জন্য অল্প পরিমাণে অক্সিজেন গৃহীত হয়।

স্বামী কুবলয়ানন্দ বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিৎগণের উক্ত ধারণা অমূলক ও ভ্রান্ত। তিনি নিশ্বাসকালে ইসোফেগাসের আভ্যন্তরীণ চাপ পরিমাপ করিয়াছেন, তলপেটের প্রসারিত ও সঙ্কুচিত অবস্থায়। তলপেট সঙ্কুচিত থাকিলে ইসোফেগাসের আভ্যন্তরীণ চাপ (intraso-esophageal pressure) হয় (পারার)-২১·২ মিলিমিটার এবং প্রসারিত তলপেটে উক্ত চাপ (পারার)-১৬·৮০ মিলিমিটার। ইসোফেগাস এবং ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ চাপদ্বয়ের মধ্যে একটি জ্ঞাতব্য অনুপাত আছে। সেইজন্য স্বামী কুবলয়ানন্দ এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছেন যে, তলপেট সঙ্কুচিত থাকিবার কালে নিশ্বাস লইলে ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ চাপের যে হ্রাস হয় তাহা প্রসারিত তলপেটের নিশ্বাস গ্রহণকালীন চাপের হ্রাস অপেক্ষা অধিকতর। ইহার স্থূল অর্থ এই যে, তলপেট সঙ্কুচিত থাকিলে যে বায়ু গৃহীত হয় তাহার পরিমাণ তলপেটের প্রসারিত অবস্থায় গৃহীত বায়ু অপেক্ষা অধিকতর। সুতরাং উজ্জায়ী প্রাণায়াম অভ্যাসকালে তলপেট কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত এবং বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বাঞ্ছনীয়।

সূর্য্যভেদন প্রাণায়ামের ন্যায় উজ্জায়ী প্রাণায়ামও দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। সুতরাং শীতকালেই উজ্জায়ী অভ্যাস অধিক উপকারী। ইহার নিয়মিত অভ্যাসে দীর্ঘ জীবন লাভ এবং শ্বাসরোগ, যক্ষারোগ ও অন্ত্ররোগাদি আরোগ্য হয়।

চারি বন্ধ ও দুই দৃষ্টি

উড্ডীয়ান বন্ধ

উড্ডীয়ান বন্ধে কুক্ষি ও পঞ্জরের উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়। ইহা বসিয়া বা দাঁড়াইয়া করা যায়। বসিয়া করিলে হস্তদ্বয় স্ব স্ব হাঁটুর উপর এবং দাঁড়াইয়া করিলে স্ব স্ব উরুর উপর বিন্যস্ত থাকিবে। হস্তদ্বয়ের সুশৃঙ্খল বিন্যাস দ্বারা স্কন্ধদ্বয় ও গ্রীবার পেশীগুলি শক্ত করা সহজ হয়। তৎপরে তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীসমূহ বলপূর্বক সঙ্কুচিত করিয়া গভীরতম প্রশ্বাস ফেলিবেন। বুকও সঙ্কুচিত থাকিবে এবং স্কন্ধদ্বয় ও গ্রীবার সকল পেশী শক্ত হইয়া উঠিবে। বাহিরে বায়ু নিরুদ্ধ হইবে। এখন জোরে কয়েকবার কৃত্রিম নিশ্বাস (mock inhalation) লউন। ইহাতে যুগপৎ পঞ্জর উন্নত এবং তলপেটের মাংসপেশীগুলি সম্প্রসারিত হইবে; কিন্তু বায়ু ফুসফুসে যাইবে না। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে উড্ডীয়ানের বিস্তৃত ও সচিত্র বিবরণ দ্রষ্টব্য।

স্কন্ধদ্বয় ও গ্রীবার কাঠিন্য, গভীরতম প্রশ্বাসান্তে সজোরে কৃত্রিম নিশ্বাস এবং তলপেটের সম্মুখস্থ সঙ্কুচিত পেশীগুলির শৈথিল্য-যুগপৎ এই ক্রিয়াত্রয় দ্বারাই উড্ডীয়ান বন্ধ পূর্ণাঙ্গ হয়। ইহাতে স্বতঃই ডায়াফ্রাম উঠিবে এবং তলপেট ভিতরে ঢুকিবে। দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে কিঞ্চিত ঝুঁকিয়া পড়িলে তলপেটের শূন্যগর্ভতা (concavity) বাড়ে। সম্প্রতি বর্ণিত অবস্থান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ উড্ডীয়ান ব্যায়াম হয়। যখন বাহিরে বায়ু ধারণ আর আরামদায়ক হয় না তখনও ঘাড় ও স্কন্ধদ্বয় শিথিল করিয়া, পঞ্জরদ্বয় নামাইয়া ও তলপেটের শূন্যগর্ভতা

কমাইয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস লওয়া উচিত। নিশ্বাস গ্রহণ পূর্ণ হইলেই একবার উড্ডীয়ান হয়। সংস্কৃতে উড্ডীয়ানের অর্থ উন্নয়ন এবং বন্ধ শব্দের অর্থ সংকোচন। ইহাতে ডায়াফ্রামের উন্নয়ন এবং তলপেটের সংকোচন হয় বলিয়া ইহাকে উড্ডীয়ান বন্ধ বলে। শরীরতত্ত্বের ভাষায় ইহার নাম উড্ডীয়ান।

উড্ডীয়ান অভ্যাসে দেহযনের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়। ইহাতে তলপেটের উত্তম ব্যায়াম হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় ও যকৃৎ রোগাদি আরোগ্য করিতে ইহা সর্বতোভাবে সমর্থ। যাহাদের তলপেটে অন্তঃক্ষত, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস প্রভৃতি রোগ আছে তাহাদের পক্ষে এই ব্যায়াম করা অনুচিত। উড্ডীয়ান অভ্যাস কালে ক্ষুদ্রান্ত্র ও মলভাণ্ড প্রভৃতির অবস্থান কিরূপ হয় তাহা স্বামী কুবলয়ানন্দ বহু এক্স-রে (X-ray) ফটো লইয়া দেখিয়াছেন। সেই রেডিওগ্রাফগুলি (radiographs) 'যোগ মীমাংসা' ত্রৈমাসিকে বিস্তৃত বিবরণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। শিব সংহিতায় (৪।৭২) আছে—

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডীয়ান বন্ধ এষঃ স্যাৎ......... ॥

অনুবাদ—নাভির উর্ধ ও অধো দেশকে (অর্থাৎ সমগ্র উদর) নাভিমূল পর্যন্ত বার বার টানিয়া আনা ও ছাড়িয়া দেওয়াকে উড্ডীয়ান বন্ধ বলে। যোগকুণ্ডলী উপনিষদে (১।৪৭) আছে—"সুষুম্নায়াং প্রাণস্তু উড্ডীয়তে যতঃ" ইহার অর্থ, যাহার দ্বারা প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয় তাহাকে উড্ডীয়ান বলে। সাধারণতঃ প্রাণবায়ু ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ে বিচরণ করে। যখন সুষুম্নাতে প্রাণবায়ু প্রবেশ করে তখন নবজীবন ও নবশক্তি লাভ হয়।

যোগ চূড়ামণি উপনিষদের ৪৮ শ্লোকে আছে—

উড্ডীয়ানং কুরুতে যস্মাৎ অবিশ্রান্তং মহাখগঃ।
উড্ডীয়ানং তদেব স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গ-কেশরী ॥

অনুবাদ—ইহার দ্বারা প্রাণবায়ুরূপ মহাপক্ষী অনায়াসে মহাকাশে বিচরণ করে এবং মৃত্যুরূপ হস্তীকে কেশরীবৎ জয় করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রাদি ইচ্ছার অনধীন (involuutary) পেশীগুলির বৃত্তাকার তরঙ্গতুল্য অগ্রগতি হয়। ইহাকে peristalsis বলে। যে স্থানে উক্ত গতি উৎপন্ন হয় সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া উহা এক দিকে বিস্তৃত হয় এবং অন্ত্রস্থ পদার্থকে মলভাণ্ডের অভিমুখে চালিত করে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা পরিমিত হইয়াছে যে, এই তরঙ্গাকার গতির বেগ প্রত্যেক মিনিটে ২০ হইতে ৩০ মিলিমিটার। উক্ত গতির দ্বারা মল-মূত্র-বায়ু নিম্ন মুখে চালিত এবং দেহ হইতে নির্গত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রাদিতে পশ্চাৎ গতি (antiperistalsis) উৎপন্ন হইলে অসার পদার্থ কিকামে (cecum) প্রবিষ্ট হইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। ক্যানন (Cannon) সাহেব বিড়ালের উপর অনেক পরীক্ষা দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রাদির পশ্চাৎ গতিও নিরীক্ষণ করিয়াছেন। উড্ডীয়ান ও নৌলীতে ক্ষুদ্রান্ত্রাদির তরঙ্গতুল্য অগ্রগতি বৃদ্ধি হয়; কিন্তু পশ্চাৎ গতি সৃষ্টি হয় না। যদিও পশ্চাৎ গতি (antiperistalsis) সৃষ্ট হয় তাহা ক্ষণিক ও নগণ্য। ডাঃ হার্স্ট (Hurst) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অন্ত্রাদির ক্ষণিক পশ্চাৎ গতিও স্বাভাবিক ও উপকারী এবং উহা পরবর্তী অগ্রগতির পরিবর্ধক।

জালন্ধর বন্ধ

পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে বসিয়া জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করিতে হয়। সম্ভবতঃ মহাযোগী জালন্ধর উক্ত বন্ধের আবিষ্কারক বা প্রচারক ছিলেন। কেহ কেহ কোন আসনে না বসিয়াই এই বন্ধ অভ্যাস করেন। ইহা অনিষ্টকর না হইলেও আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। এই বন্ধে চিবুকটি কণ্ঠকূপে দৃঢ়বদ্ধ করা আবশ্যক। তদ্রুপ করিতে হইলে মস্তক ও গ্রীবাকে সম্মুখ দিকে বাঁকাইতে হয়। কাহারো কাহারো মতে কণ্ঠকূপের চারি আঙ্গুল নীচে চিবুক লাগাইলেও চলে। আমাদের মতে প্রথম বিধি কষ্টকর এবং দ্বিতীয় বিধি সহজসাধ্য। সুতরাং অভ্যাস সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিধি প্রথম শিক্ষার্থীর অনুষ্ঠেয়। যৌগিক প্রবাদমতে জাল শব্দের অর্থ মস্তিষ্ক ও গ্রীবাদেশেব মধ্য দিয়া প্রসারিত স্নায়ুজাল এবং ধর শব্দের অর্থ ঊর্ধ্বমুখী টান। এই বন্ধে মেরুদণ্ড ও খুব সম্ভবতঃ তন্মধ্যস্থ স্নায়ুগুচ্ছের উপর ঊর্ধ্বমুখী টান পড়ে। উক্ত টান মস্তিষ্ক ও তন্মধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রের উপর ক্রিয়াশীল হয়। জালন্ধর বন্ধ পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে বসিয়া করিলে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের উত্তম ব্যায়াম হয়। উড্ডীয়ান ও জালন্ধর বন্ধদ্বয় একত্রে করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। শিব সংহিতায় (৪।৬০-৬২) আছে—

বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধর প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ॥
নাভিস্থবহ্নির্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতম্।
পিবেৎ পীযুষবিস্তারং তদর্থং বর্জয়েৎ ইমম্॥
বন্ধেনানেন পীযুষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বং চ সম্প্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে॥

অনুবাদ—গলদেশস্থ শিরাজাল বন্ধ করিয়া বক্ষে চিবুক লাগাইলে জালন্ধর বন্ধ হয়। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। সকল প্রাণীর নাভীদেশে উদরাগ্নি বিদ্যমান। মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃত যাহাতে উক্ত অগ্নি গ্রাস করিতে না পারে সেইজন্য জালন্ধর বন্ধ করিতে হয়। এই বন্ধ সহায়ে বুদ্ধিমান যোগী সহস্রারচ্যুত পীযূষ পানপূর্বক অমরত্ব লাভ এবং ত্রিভুবনে মহানন্দে বিচরণ করেন।

উক্ত বন্ধে চিবুক কণ্ঠকূপে দৃঢ়বদ্ধ থাকায় গলদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে খুব চাপ পড়ে। শিরস্থিত সমস্ত স্নায়ু গলদেশ দিয়া দেহকাণ্ডে প্রসারিত বলিয়া সহস্রারের সহিত বিশুদ্ধ চক্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। বিশুদ্ধ চক্র ষোড়শ-দল পদ্ম। ইহার বৈজ্ঞানিক অর্থ এই যে, ইহাতে যে স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত তাহা হইতে ষোলটি প্রধান স্নায়ু (বা নাড়ী) নিম্নোক্ত ষোলটি স্থানে বিস্তৃত—অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, পদদ্বয়ের পেশীসমূহ (calf), হাঁটুদ্বয়, উরুদ্বয়, উরুসন্ধিযুগল, জননেন্দ্রিয়, নাভিমূল, হৃৎপিণ্ড, কণ্ঠনালী, গ্রীবার উর্ধাংশ, আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র (glottis), ভ্রূযুগল, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদেশ, মাথার খুলি (skull) এবং কপালের পশ্চাৎস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র ইত্যাদি।

জালন্ধর বন্ধ অভ্যাসকালে উপরোক্ত ষোলটি স্থানের স্নায়ু সঞ্চালিত ও সঞ্জীবিত হয়। ঘাড় বাঁকাইয়া কণ্ঠকূপে দৃঢ়বদ্ধ রাখার জন্য কখনো কখনো পীঠে একটু ব্যথা হয়। গব্যঘৃত ও ইউকেলিটাস তৈল মিশাইয়া ঘাড়ে মালিশ করিলে সেই ব্যথা অচিরে সারিয়া যায়।

মহাবন্ধ

শিব সংহিতায় (৪।৩৭-৪২) মহাবন্ধের এইরূপ বর্ণনা আছে—

ততঃ প্রসারিতঃ পাদৌ বিন্যস্য তমুরূপরি।
গুদাযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগম্॥
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণম্ অধোমুখম্।
বন্ধয়েৎ ঊর্ধগত্যর্থং প্রাণাপানেন যঃ সুধীঃ॥
কথিতোঽয়ং মহবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গ-প্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাৎ রসব্যূহো মূর্ধানং যান্তি যোগিনঃ॥
ভবেৎ অভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ॥
অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ় বন্ধোঽস্থিপঞ্জরে॥
সম্পূর্ণহৃদয়ো যোগী ভবন্ত্যেতানি যোগিনঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্বমীপ্সিতম্॥

অনুবাদ—পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া ডান পদ বাম পদের উপর রাখুন। তৎপরে মলদ্বার এবং মূত্রদ্বারাদি আকুঞ্চিত করিয়া অপান বায়ুকে ঊর্ধগামী করুন এবং ইহাকে সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করুন। তৎপরে প্রাণবায়ু অধোমুখী করিয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া বুদ্ধিমান উভয়কে ঊর্ধ দিকে আকর্ষণ করিবেন। ইহাকে মহাবন্ধ বলে। ইহা সাধককে সিদ্ধিমার্গে আরূঢ় করে। ইহা দ্বারা নাড়ীসমূহ হইতে নিঃসৃত রস-ধারা শিরোমুখে ধাবিত হয়। মহাবন্ধ অভ্যাসের ফলে প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ীর মধ্যবর্তী হয় এবং দেহ পরিপুষ্ট ও পেশীসমূহ শক্তিশালী হয়। যোগীবরের হৃদয় আনন্দপূর্ণ থাকে এবং তিনি এই বন্ধাভ্যাসে সর্বাভীষ্ট লাভ করেন।

মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া মহাবেধ অভ্যাস করিতে হয়। মহাবেধের বর্ণনা যোগতত্ত্ব উপনিষদের ১১৫-১১৭ শ্লোকে এইরূপ পাওয়া যায়।—

মহাবন্ধস্থিতো যোগী কৃত্বা পূরকমেকধীঃ।
বায়ুনাং গতিমাবৃত্য নিভৃতং কণ্ঠমুদ্রয়া॥
পুটদ্বয়ং সমাক্রম্য বায়ুঃ স্ফুরতি সত্বরম্।
অয়মেব মহাবেধঃ সিদ্ধৈরভ্যস্যতেঽনিশম্॥

অনুবাদ—একাগ্র মনে যোগী নিভৃতে মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া উভয় নাসায় বায়ু পূরকান্তে জালন্ধর বন্ধ (কণ্ঠমুদ্রা) দ্বারা বায়ুর গতি রোধ করিবেন। ইহাকে মহাবেধ বলে। সিদ্ধ যোগীগণ এই বন্ধ সর্বদা অভ্যাস করেন।

শিবসংহিতায় (৪।৪৩-৪৪) মহাবেধ সম্বন্ধে এই বর্ণনা আছে।

অপান-প্রাণয়োরৈক্যম্ কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহাবেধস্থিতো যোগীঃ কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা॥
স্ফীচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ম্ কীর্তিতঃ ময়া।
বেধেনানেন সংবিদ্ধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেন ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ॥

অনুবাদ—শিব বলিলেন, “হে ত্রিভুবনেশ্বরী, প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়ের ঐক্য করিয়া যোগী মহাবেধস্থিত হইয়া বায়ুর দ্বারা কুক্ষি পূর্ণ করিবেন। ইহাতে উভয় পার্শ্বে বায়ুর চাপ পড়িবে। যোগীবর মহাবেধের দ্বারা প্রাণবায়ু সুষুম্নামার্গে চালিত করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবেন।”

মূলবন্ধ

মূলবন্ধে প্রধানতঃ মলদ্বারাদির ব্যায়াম হয়। সিদ্ধাসনের অঙ্গরূপে ইহা অভ্যাস করা উচিত। আসন ব্যতীতও এই বন্ধ অভ্যাস করা যায়; কিন্তু ঐরূপ করিলে সমুদয় ইপ্সিত ফল পাওয়া যায় না। মলদ্বার হইতে মলভাণ্ড পর্য্যন্ত যে সকল বাহ্য ও আন্তর পেশী আছে সেগুলি এই বন্ধে সজোরে উর্ধদিকে আকুঞ্চিত করিতে হয়। মলদ্বার ও মূত্রদ্বার সংকোচনের দ্বারা সমগ্র বস্তিদেশের (pelvis) ব্যায়াম হয়। সুতরাং মূলবন্ধকে বস্তিদেশের ব্যায়াম বলা যাইতে পারে। ইহাতে মূলাধারস্থ স্নায়ুমূলসমূহের উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয় বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম মূলবন্ধ। দেহকাণ্ডে যে সকল স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত সেইগুলি মূলবন্ধে প্রভূত ব্যায়ামপ্রাপ্ত হয়। মূলবন্ধ অভ্যাসে উল্লিখিত বিধি অনুসৃত না হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে পারে। গুহ্যদ্বার সংকোচনে জননেন্দ্রিয়ও সংশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং উভয় বিষয়ে সাবধান হইয়া মূলবন্ধ অভ্যাস শ্রেয়স্কর।

শিবসংহিতায় (৪।৬৪-৬৫) আছে—

পাদমূলেন সংপীড্য গুদামার্গেষু যন্ত্রিতম্।
বলাৎ অপানম্ আকৃষ্য ক্রমাৎ উর্ধং সুচারয়েৎ॥
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণ-নাশনং॥

অনুবাদ—গোড়ালী দ্বারা মলদ্বার বন্ধ করিয়া বলপূর্বক অপান বায়ুকে উর্ধে আকর্ষণান্তে ক্রমশঃ প্রাণবায়ুর সমীপে চালিত করিবেন। ইহাকে মূলবন্ধ বলে। ইহা জরা-মৃত্যু নাশক অর্থাৎ দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ জীবন প্রদায়ক।

উক্ত সংহিতায় (৪।৬৬) আছে।—

অপান-প্রাণয়োঃ ঐক্যং করোত্যধিকল্পিতম্।
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনীমুদ্রা প্রসিধ্যতি ॥

অনুবাদ—মূলবন্ধে প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়ের সংযোগ সাধিত হয়। ইহার ফলে স্বতঃই যোনীমুদ্রা হইয়া যায়।

মলদ্বারের কিঞ্চিৎ উর্ধে মূলাধার চক্র অবস্থিত। মূলবন্ধে মূলাধারের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়। ইহাতে মলদ্বারের সংকোচন ও প্রসারণ পর্য্যায়ক্রমে (Periodically) করা আবশ্যক। মূলাধারে আপন বায়ু অবস্থিত। আপন বায়ু প্রাণবায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা ও স্বপ্নদোষাদি হয়। মূলবন্ধে শুক্রের উর্ধমুখী গতি বাড়ে এবং মল-মূত্র-বায়ু সহজে বহির্গত হইয়া দেহকে সুস্থ রাখে। ইহাতে স্বপ্নদোষাদি কমিয়া যায় ও বীর্য্যধারণ শক্তি বর্ধিত হয়।

ভ্রূমধ্য দৃষ্টি

ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাকে ভ্রূমধ্য দৃষ্টি বলে। সিদ্ধাসনের অঙ্গরূপে ইহা অভ্যাস করা উচিত। আসন ব্যতীতও কেহ কেহ ইহা অভ্যাস করেন; কিন্তু তাহা নিরাপদ নহে। ভ্রূমধ্য দৃষ্টি অভ্যাস দ্বারা মানসিক একাগ্রতা ও চিত্ত-স্থৈর্য লাভ হয়। যাহাদের চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি বা ছানিযুক্ত তাহাদের ইহা অভ্যাস করা অনুচিত। নেত্রস্নায়ু দুর্বল থাকিলে ইহা অভ্যাস করিবেন না।

নাসাগ্র দৃষ্টি

নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাকে নাসাগ্র দৃষ্টি বলে। পদ্মাসনের অঙ্গরূপে বা স্বতন্ত্রভাবে ইহা অভ্যাস করা যায়। চঞ্চল মনকে সংযত করিবার ইহা একটী উত্তম উপায়। ক্রীড়াচ্ছলেও কয়েকমাস নাসাগ্র দৃষ্টি অভ্যাস করিলে মন সংযত ও সুস্থির হয়। নেত্র-স্নায়ুসমূহের মাধ্যমে ইহা মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করে। সুতরাং অতি সাবধানে ও ধৈর্য্য সহাকারে উক্ত দৃষ্টি অভ্যাস করিবে। যাহাদের নেত্রস্নায়ু দুর্বল তাহারা অভিজ্ঞের উপদেশ ব্যতীত ইহা অভ্যাস করিবেন না। গীতায় (৬।১৩) মেরুদণ্ড, গ্রীবা এবং মস্তক সরল ও নিশ্চল রাখিয়া নাসিকাগ্র দর্শন বিহিত। নাসিকাগ্র দর্শনে দশ দিকের অনবলোকন নিমিত্ত মন শান্ত হয়। এই দৃষ্টিদ্বয় অভ্যাসের দ্বারা বায়ু স্থির হয় এবং বায়ু-স্থৈর্য্যের ফলে মনের স্থিরতা আসে।

———

ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম

স্বাত্মারাম সূরী কৃত 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় যে আট প্রকার প্রাণায়াম বিবৃত তন্মধ্যে ভস্ত্রিকা অন্যতম। কপালভাতির সহিত ভস্ত্রিকার সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। উক্ত গ্রন্থে (২।৫৯) ভস্ত্রিকা-কৌশল বর্ণনার প্রারম্ভে আছে, "সম্যক্ পদ্মাসনং বদ্ধা…" ; অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে পদ্মাসন-বদ্ধ হইয়া ভস্ত্রিকা করিবে। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'র টীকাকার ব্রহ্মানন্দ বলেন, "ভস্ত্রাকুম্ভকস্য পদ্মাসনপূর্বকমেবানুষ্ঠানাৎ তদাদৌ পদ্মাসনমাহ।" ইহার অর্থ গ্রন্থকার ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম বর্ণনার পূর্বে পদ্মাসনের বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং পদ্মাসনই প্রাণায়ামের পক্ষে প্রশস্ত।

ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম চারি প্রকার। প্রথম দুই প্রকারে দুই নাসা এবং শেষ দুই প্রকারে এক নাসা ব্যবহৃত হয় বায়ুরেচনে। এই চারি প্রকারেই গ্রাম্য কামারের হাপরবৎ সোঁ সোঁ শব্দ উত্থিত হয় অবিরত ও দ্রুত বায়ু রেচনে। সেই হেতু এই প্রাণায়ামের নাম ভস্ত্রিকা। কামারশালায় যে হাপর (bellows) থাকে তাহাকে সংস্কৃতে ভস্ত্রা বা ভস্ত্রিকা বলে হাপরবৎ দ্রুত বায়ুরেচন সর্বপ্রকার ভস্ত্রিকার বিশেষত্ব। স্বাত্মারাম সূরী 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় (২।৬১-৬২) বলেন।—

পুনর্বিরেচয়েৎ তদ্বৎ পূরয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
যথৈব লৌহকারেণ ভস্ত্রাবেগেন চাল্যতে॥
তথৈব স্বশরীরস্থং পবনং চালয়েৎ ধিয়া।

অনুবাদ—যেমন লৌহকার তাহার হাপর সবেগে চালাইতে থাকে তদ্রূপ স্বদেহস্থিত বায়ু মনোযোগের সহিত দ্রুতবেগে পুনঃ পুনঃ পূরক ও রেচক করিবেন। স্বাত্মারামের মতে ইহাই ভস্ত্রিকার সংজ্ঞা। এই প্রাণায়ামে ভস্ত্রিকাবৎ বায়ুরেচন হয় বলিয়া ইহার উক্ত নামকরণ হইয়াছে।

চারি প্রকার ভস্ত্রিকার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকারই সমধিক প্রচলিত। ঘেরণ্ড সংহিতায় (৫।৭৫-৭৭) এই প্রাণায়ামই প্রশংশিত। ইহার প্রথমাংশের সহিত কপালভাতির নিকট সাদৃশ্য আছে। যাহারা উজ্জায়ী ও কপালভাতির অভ্যাস-কৌশল অবহিত আছেন তাহাদের নিকট ভস্ত্রিকা নূতন প্রতীত হইবে না। ভস্ত্রিকায় নিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে তলপেটেই চলে এবং তলপেটের ক্রমাগত সংকোচন দ্বারা পঞ্জর উত্থিত হইয়া বিধৃত থাকে। দ্রুত বেগে পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাস পরিত্যাগের জন্য দুই নাক ব্যবহৃত হয়। তলপেটস্থ পেশীগুলিকে শিথিল করার জন্য নিশ্বাস নিশ্চেষ্ট ভাবে চলিতে থাকে। বস্তুতঃ ভস্ত্রিকার উক্তাংশ কপালভাতির সমতুল্য।

ঘেরণ্ড সংহিতার মতে ভস্ত্রিকা অভ্যাসকালে বিশ বার প্রশ্বাসের পর উজ্জায়ীর মত গভীরতম পূরক করিতে হইবে। প্রশ্বাসের সংখ্যা অধিক, কি অনধিক হইবে তাহা সাধকের ফুসফুস-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। ইহাতে দুই নাকে পূরক করিতে হয় এবং তলপেটের পেশীগুলি সংকুচিত থাকে। উজ্জায়ীর মত নাসারন্ধ্র আংশিক বন্ধ এবং তজ্জন্য তথায় বায়ুর ঘর্ষণজাত শব্দ হইবে না। ভস্ত্রিকায় নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকিবে এবং বুক ফুলাইয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস লইতে হইবে। পূরকের কাল অন্ততঃ আট সেকেণ্ড হওয়া দরকার।

নাসাপথে ও গলদেশে নিশ্বাস বায়ু গমন কালে কোন শব্দ উঠিবে না। উজ্জায়ীর সহিত ভস্ত্রিকার এইখানে পার্থক্য।

ভস্ত্রিকায় পূরকের পরেই কুম্ভক। উজ্জায়ীর ন্যায় ইহাতে অঙ্গুলি দ্বারা নাসাদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিয়া জালন্ধর বন্ধ সহ নিশ্বসিত বায়ু ধারণ করিতে হয়। উজ্জায়ী ও ভস্ত্রিকার কুম্ভক যুগল সর্বাংশে একই প্রকার। কুম্ভকের পরেই রেচক। উভয় রেচকের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ভস্ত্রিকার পূরক ও রেচক দুইটিতেই নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। ইহাতে নাক হইতে আঙ্গুল সরাইয়া ও জলান্ধর বন্ধ খুলিয়া ধীরে ধীরে বায়ুরেচন করিতে হয়। পরিশেষে বক্ষঃস্থল ও তলপেটের যুগপৎ সঙ্কোচন দ্বারা ফুসফুসের বায়ু মৃদু গতিতে বাহিরে যায়। কুম্ভক-বর্জিত পূরক ও রেচক পর্য্যায়ক্রমে অগভীর হয়; কিন্তু কুম্ভক-সহিত পূরক ও রেচক যথাসম্ভব গভীরতম হইয়া থাকে।

ভস্ত্রিকার প্রথমাংশ ও শেষাংশ যথাক্রমে কপালভাতি ও উজ্জায়ীর সুসদৃশ। নবীন শিক্ষার্থী প্রথমে দ্রুত প্রশ্বাস ঘন ঘন ছাড়িবেন এবং সর্বশেষ প্রশ্বাসের পরে গভীরতম নিশ্বাস লইবেন। যতক্ষণ আরাম-দায়ক ভাবে বায়ু ধারণ করা যায় ততক্ষণ কুম্ভক রাখিয়া গভীর প্রশ্বাস ত্যাগ করিবেন। এইরূপে একবার ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম হয়। বিশ্রামার্থ ইহার পর কয়েক বার স্বাভাবিক নিশ্বাস গ্রহণান্তে দ্বিতীয় বার ভস্ত্রিকা অভ্যাস করিতে হয়। ঘেরণ্ড সংহিতা স্বাস্থ্যরক্ষার্থ প্রথমতঃ দৈনিক তিন বার মাত্র ভস্ত্রিকা অভ্যাসের উপদেশ দিয়াছেন। বোম্বাই নগরে স্বামী কুবলয়ানন্দের আশ্রমে উক্ত বিধি অনুসরণপূর্বক অসংখ্য শিক্ষার্থী অশেষ উপকৃত হইয়াছেন। অন্যান্য যৌগিক

ব্যায়ামের সঙ্গে এইরূপ অল্প মাত্রায় প্রাণায়াম অভ্যাসই যথেষ্ট। একটী সংস্কৃত প্রবাদ আছে, 'অল্পারম্ভ ক্ষেমকর' অর্থাৎ অল্প মাত্রায় যাহা আরম্ভ করা যায় তাহা নিরাপদ ও হিতকর।

ভস্ত্রিকার দ্বিতীয় প্রকার 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় প্রশংশিত। ইহাতে নাসারন্ধ্র আংশিক ভাবে বন্ধ থাকায় বায়ুর ঘর্ষণজাত শব্দ হয় নিশ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস ত্যাগের সময়। নাসারন্ধ্রের এইরূপ আংশিক সংকোচন টীকাকার ব্রহ্মানন্দের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার মতে দুই নাকের পরিবর্তে একটী মাত্র নাক ব্যবহার্য। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় (২।৫৯-৬০) আছে—

মুখং সংযম্য যত্নেন প্রাণং ঘ্রাণেন রেচয়েৎ।
বেগেন পূরয়েচ্চাপি ·· ॥

অনুবাদ—মুখ বন্ধ করিয়া সবেগে নাক দিয়া বায়ু রেচন করিবেন এবং তৎপরে শীঘ্র নিশ্বাস পূর্ববৎ লইবেন।

মুলোক্ত "ঘ্রাণেন"="ঘ্রাণস্য একতরেণ রন্ধ্রেণ" ধরিয়া টীকাকার ব্রহ্মানন্দ নাসিকার একটী রন্ধ্র দিয়া রেচনের উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু স্বাত্মারাম সুরী কোথায় এক নাক বা কোথায় দুই নাক ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ঘ্রাণেন' একবচন বলিয়া ইহার অর্থ এক নাক হইবে না। 'হঠযোগ' প্রদীপিকা'য় (২।৫৩) "ঘ্রাণেনৈব" অংশের অর্থ টীকাকারের মতে দুই নাক। তিনি উক্ত অংশের টীকায় বলেন, "ঘ্রাণেনৈব নাসিকয়ৈবেত্যনেনোভাভ্যাং নাসা-পুটাভ্যাং রেচক ইত্যুক্তম্।" ইহার অর্থ, ঘ্রাণের দ্বারা=নাসিকার দ্বারা। সুতরাং উভয় নাসাপুট দ্বারা রেচক কর্তব্য। এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার ভস্ত্রিকায় উভয় নাসাপুট ব্যবহারই কর্তব্য।

প্রশ্বাসের মাত্রা সম্বন্ধে "হঠযোগ প্রদীপিকা'য় (২:৬২) আছে, "যথা শ্রমো ভবেৎ দেহে…।" ইহার অর্থ দৈহিক ক্লান্তিনাহওয়া পর্যান্ত নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে সংখ্যার দ্বারা মাত্রা নির্ধারিত হয় নাই; কারণ সাধকের দৈহিক সামর্থ্য দ্বারাই রেচকের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে। ইহা অতিশয় যুক্তিসঙ্গত উপদেশ। ভস্ত্রিকায় পূরকের পরেই কুম্ভক, কুম্ভকের পরেই রেচক। ইহাতে ডান ন্যাকে পূরক ওবাম নাকে রেচক হইবে। সুতরাং শেষ প্রশ্বাসের পরে ডান নাকে গভীরতম নিশ্বাস লইয়া যথাসাধ্য কুম্ভকান্তে নিঃশেষে বায়ু রেচন করিবেন। বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রণার্থ ডান হাত নাকের উপর থাকিবে। কুম্ভকের পরে গভীরতম রেচন আবশ্যক। ইহাতে একবার প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে ডান হাতটি হাঁটুর উপর নামাইয়া বিশ্রামার্থ কয়েক বার স্বাভাবিক নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন। ইহার পরেই দ্বিতীয় বার প্রাণায়াম আরম্ভ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে যে প্রভেদ আছে সেইগুলিই প্রধানতঃ উল্লিখিত হইল। অন্যান্য অংশ উভয় প্রকারে সমান।

তৃতীয় প্রকার ভস্ত্রিকাকেও দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ যথাক্রমে কপালভাতি ও উজ্জায়ীর সুসদৃশ। প্রথমাংশে ডান নাক বন্ধ থাকে ও বাম নাক দিয়া রেচন হয়। ইহাতে উজ্জায়ীর মতই নাসিকায় অঙ্গুলি ব্যবহার্য্য। ব্রহ্মানন্দের মতে ভস্ত্রিকার বিজোড় সংখ্যায় ডান নাক এবং জোড় সংখ্যায় বাম নাক ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং এই প্রাণায়ামে কপালভাতির মত প্রথম, তৃতীয় ও পরবর্তী বিজোড় বারসমূহে ডান নাক দিয়া প্রশ্বাস ফেলিতে হয় এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ প্রভৃতি জোড় বারে

বাম নাক দিয়া বায়ু পূরণ করিতে হয়। প্রত্যেক বিজোড় বারে ডান নাক দিয়া গভীর নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রত্যেক জোড় বারে বাম নাক দিয়া গভীর প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চমাদি বিজোড় বারে ডান নাকে গভীর নিশ্বাস এবং বাম নাকে গভীর প্রশ্বাস চলে মধ্যবর্তী কুম্ভকের পরে। কিন্তু দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠাদি জোড় বারে বাম নাকে গভীর নিশ্বাস ও ডান নাকে গভীর প্রশ্বাস চলে।

সংক্ষেপে তৃতীয় প্রকার ভস্ত্রিকার প্রক্রিয়া এইরূপ—বাম নাক বন্ধ রাখিয়া ডান নাক দিয়া কয়েকবার অবিরাম নিশ্বাস গ্রহণ করুন। নির্দিষ্ট সংখক নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের পরে ডান নাক দিয়া গভীর নিশ্বাস গৃহীত হয়। স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে বায়ু নিরোধ করিবার পরে বাম নাক দিয়া নিঃশেষে প্রশ্বাস ছাড়িতে হয়। ইহাতে একবার প্রাণায়াম হইবে। বাম নাক দিয়া সবেগে প্রশ্বাস ছাড়িবার পর দ্বিতীয় বার প্রাণায়াম আরম্ভ হয়। বাম নাকে গভীর নিশ্বাস গ্রহণান্তে বায়ু যথাসাধ্য কুম্ভক করিয়া ডান নাকে ছাড়িতে হয়। ইহাতে দ্বিতীয় বার সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি বার করিবেন। বাম হাত সর্বদা বাম হাঁটুর উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ডান হাত নাসিকার উপর থাকিয়া কখনও বাম, কখনও বা ডান নাসাপুট বন্ধ করিবে। বক্ষঃস্থল ও তলপেটের পেশীগুলি এবং নাসারন্ধ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রথম প্রকারের মত হইবে।

চতুর্থ প্রকার ভস্ত্রিকার প্রথম অংশে কুম্ভক নাই এবং শ্বাসগতি গভীর নহে। এক নাক দিয়া নিশ্বাস গৃহীত হইলে অন্য নাক দিয়া প্রশ্বাস ছাড়িতে হইবে। চতুর্থ প্রকারের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া এইরূপ—

ডান নাকে দ্রুত নিশ্বাস গ্রহণ এবং ঠিক তাহার পরেই বাম নাক দিয়া দ্রুত প্রশ্বাস ত্যাগ। দ্রুত নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের উক্ত শৃঙ্খল ততক্ষণ সুদীর্ঘ করা যায়, যতক্ষণ অভ্যাসকারী দৈহিক শ্রম অনুভব না করেন। ইহাই প্রাণায়ামের প্রথমাংশ মাত্র। ইহার পরে ডান নাকে গভীরতম নিশ্বাস গ্রহণ, তৎপরে যথাসাধ্য বায়ুনিরোধ বা কুম্ভক এবং শেষে বাম নাক দিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ—ইহাই ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামের দ্বিতীয়াংশ। এই উভয় অংশ মিলিত হইলে একবার প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় বারে বাম নাকে দ্রুত নিশ্বাস গ্রহণ এবং ডান নাকে দ্রুত প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। ইহাতে কুম্ভকের পরে ডান নাকে রেচক হয়।

চারি প্রকার ভস্ত্রিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহাদের প্রথমাংশে কপালভাতির মত দ্রুতবেগে রেচক ও পূরক করিতে হয় এবং শেষাংশে উজ্জায়ীর মত গভীর পূরক, যথাসাধ্য কুম্ভক এবং গভীর রেচক করা আবশ্যক। সুতরাং ভস্ত্রিকা = কপালভাতি + উজ্জায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কপালভাতিতে যে আসনে বসিতে হয় ভস্ত্রিকায় সেই আসনই প্রশস্ত। স্বাস্থ্যকামী যে কোন সুখাসনে বসিয়া ভস্ত্রিকা অভ্যাস করিবেন; কিন্তু ধর্মসাধকের পক্ষে পদ্মাসনে উপবেশনই শ্রেয়স্কর। পদ্মাসনে বসিলে হস্তদ্বয় সংযুক্ত থাকিবে; কিংবা হাঁটুদ্বয়ের উপর পৃথকভাবে জ্ঞানমুদ্রা-বদ্ধ হইবে তাহা সাধকের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ভস্ত্রিকার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারে সর্বক্ষণ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের শেষ ভাগে ডান হাত নাসিকায় ন্যস্ত থাকিবে ও বাম হাত হাঁটু বা গোড়ালীর উপর স্থাপিত হইবে। মূলবন্ধ এবং জালন্ধর বন্ধ পদ্মাসনের অংশ বলিয়া

ভস্ত্রিকারও অঙ্গীভূত। কপালভাতিতে জালন্ধর বন্ধ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ভস্ত্রিকায় কুম্ভককালে জালন্ধর বন্ধ আবশ্যক। কুম্ভক ব্যতীত অন্য সময়ে গ্রীবা উন্নত থাকিবে। তখন জালন্ধর বন্ধ অনাবশ্যক। কিন্তু মূলবন্ধ প্রাণায়ামের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিবে।

কপালভাতিতে যেরূপ মনঃসংযম আবশ্যক ভস্ত্রিকায় তদ্রূপ বিধেয়। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উজ্জায়ী+কপালভাতি=ভস্ত্রিকা। উক্ত বাক্যের কি ইহাই অর্থ যে, উজ্জায়ী ও কপালভাতির পরিবর্তে একমাত্র ভস্ত্রিকা অভ্যাস করা উচিত? তত্ত্বতঃ ইহা সত্য হইলেও কার্য্যতঃ ইহা অসম্ভব। উজ্জায়ী প্রাণায়াম আলোচনা কালে আমরা বলিয়াছি যে, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রারম্ভে কুম্ভক বর্জনই শ্রেয়ঃ। ভস্ত্রিকা অভ্যাস কালেও উক্ত বিধি প্রযোজ্য। প্রথম শিক্ষার্থী কুম্ভকবর্জিত ভস্ত্রিকা অভ্যাস করিবেন। তাহার পক্ষে এগার বার বায়ুরেচনের পরে একবার গভীর নিশ্বাস ও তৎপরে একবার গভীর প্রশ্বাস কর্তব্য। এইরূপে তিনি তিন বার মাত্র ভস্ত্রিকা করিবেন। ইহাতে মোট একুশ বার প্রশ্বাস ত্যাগ (কপালভাতির মত) এবং তিনবার গভীর নিশ্বাস এবং তিন বার গভীর প্রশ্বাস (উজ্জায়ীর মত) হয়। এই সকল নিশ্বাস ও প্রশ্বাস চার বারে করা যাইতে পারে—এগার বার রেচন-সহিত তিনবার কপালভাতি এবং তিনবার নিশ্বাসযুক্ত একবার উজ্জায়ী। পরিপক্ক ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা হইতে স্বামী কুবলয়ানন্দ বলেন, তিনবার কপালভাতি এবং একবার উজ্জায়ী অপেক্ষা তিনবার ভস্ত্রিকায় অধিকতর দৈহিক শ্রম হয়। সামান্য পরিমাণে এই তিনটির অভ্যাস দ্বারা উপরোক্ত বাক্যের যথার্থ হৃদগত হয় না; কিন্তু অধিক পরিমাণে অভ্যাস করিলে ইহা

স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সুতরাং কপালভাতি ও উজ্জায়ীর পরিবর্তে কেবলমাত্র ভস্ত্রিকা অভ্যাস বিধেয় নহে। পৃথক্ ভাবে তিনটির অভ্যাস বাঞ্ছনীয়।

নিশ্বাস ব্যায়ামরূপে কপালভাতি অপেক্ষা উজ্জায়ী অধিকতর নির্দোষ এবং ভস্ত্রিকা আরও নির্দোষ। সুতরাং নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথমে উজ্জায়ী অভ্যাস শ্রেয়স্কর। উজ্জায়ী অভ্যস্ত ও আরামদায়ক হইলে কপালভাতি উহার সহিত আরম্ভ করিবেন। কুম্ভকাভ্যাসের সামর্থ্য অর্জিত হইলেই তিনি ভস্ত্রিকার কথা ভাবিবেন, তৎপূর্বে নহে। এই তিনটি যৌগিক ব্যায়ামের সামঞ্জস্য বিধানেও সতর্কতা অবলম্বনীয়। প্রারম্ভে তিনবার কপালভাতির স্থানে তিনবার ভস্ত্রিকা করা উচিত। অভ্যাস অগ্রসর হইলে ভস্ত্রিকার প্রথম অংশকে ৬০, ৪০, ৩০, ২০ প্রভৃতি সুবিধাজনক ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক ভাগের সহিত ভস্ত্রিকার শেষাংশ সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেক বার ভস্ত্রিকা ২, ৩, ৪ এবং শেষ পর্য্যন্ত ৬ ভাগে বিভক্ত করা যায়। স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে কপালভাতি ছয় বার অভ্যাস যথেষ্ট। প্রত্যেক বার কপালভাতি ছয় বার ভস্ত্রিকার সমান হইলে ভস্ত্রিকার মোট সংখ্যা হয় ছত্রিশ। স্বাস্থ্যকামী ইহার অধিক বার ভস্ত্রিকা অভ্যাস করিবেন না।

যৌগিক ব্যায়ামের দৈনিক অভ্যাস-তালিকায় ভস্ত্রিকার সংখ্যা নয়ের অধিক হইলে সেই অনুপাতে উজ্জায়ী কমাইতে হইবে। যখন ভস্ত্রিকার উর্দ্ধতম সংখ্যা ছত্রিশ হয় তখন উজ্জায়ী একেবারে বর্জনীয়। অবশ্য ইহা কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নহে। নিশ্বাস ব্যায়ামগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানার্থ এই সাধারণ বিধি নির্দেশিত

হইল। এখানে ইহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে, ঘেরণ্ড সংহিতা ভস্ত্রিকায় বিশ বার রেচকের বিধান দিয়াছেন। ভস্ত্রিকার আধ্যাত্মিক মুল্য অধিকতর বলিয়া ধর্মসাধক আরও অধিক পরিমাণে ইহা অভ্যাস করিবেন। ভস্ত্রিকা অভ্যাস কালে প্রত্যেক ভস্ত্রিকাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। সুতরাং এক উপবেশনে ভস্ত্রিকার মোট সংখ্যা হইবে আঠার। প্রত্যহ অধিক সংখ্যক ভস্ত্রিকার প্রয়োজন হইলে এই আঠার বারকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত না করিয়া আঠার অপেক্ষা অধিক বার করিবেন, অথবা উপবেশনের দৈনিক সংখ্যা একাধিক বার বাড়াইবেন। ভস্ত্রিকার বার বা উপবেশনের সংখ্যা বাড়াইবার সময় অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ কর্তব্য।

ভস্ত্রিকাভ্যাসে শীতোষ্ণ সমান ভাবে বিজিত হয়। সুতরাং ইহা সারা বৎসর অভ্যাস করা যায়। ইহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্য রক্ষিত হওয়ায় দেহে রোগ আসিতে পারে না। ইহাতে ফুসফুসের বায়ুধারণ শক্তি বাড়ে ও সুষুম্নার বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানের সামর্থ্য বর্ধিত হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় দশ বার করিয়া ছয় মাস ভস্ত্রিকা অভ্যাসের ফলে রক্তমাংসময় দেহের প্রবল প্রভাব অতিক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যকামী ভস্ত্রিকাভ্যাসে নীরোগ সকল শরীর এবং সুদীর্ঘজীবন লাভ করিবেন।

———

কপালভাতি

হঠযোগ প্রদীপিকায় (২-২২) এই ছয় প্রকার যৌগিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাত আছে।—

ধৌতির্বস্তিস্তথানেতিস্ত্রাটকং নৌলিকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্ কর্মাণি প্রচক্ষ্যতে।

অনুবাদ—ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলী ও কপালভাতি এই ছয়টিকে যৌগিক প্রক্রিয়া বলে।

নৌলীর বিশদ বর্ণনা এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদত্ত। কপালভাতি উক্ত ষট্ কর্মের অন্যতম এবং দুইটী শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন। কপাল শব্দের অর্থ ললাট বা মস্তক (skull) এবং ভাতি শব্দের অর্থ উজ্জ্বল। উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ললাটদেশ উজ্জ্বল হয় বলিয়া ইহার নাম কপালভাতি। ইহার দ্বারা নাসিকাগহ্বর এবং শ্বাস-নালীর অবশিষ্ট অংশ বিশেষভাবে পরিষ্কৃত হয়। স্বামী কুবলায়ানন্দ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কপালভাতি কৈশিকগুলি (capillaries) পর্যন্ত পরিষ্কার করিতে সমর্থ। কপাল-ভাতি একটী উত্তম নিশ্বাস ব্যায়াম। ঘেরণ্ড সংহিতার (১—৫৫) মতে কপালভাতি তিন প্রকার। অন্য দুই প্রকার জলের সাহায্যে করিতে হয়। এইজন্য সেই দুইটীকে নাসিকার যৌগিক ডুস বলা যাইতে পারে। হঠযোগ প্রদীপকার মতে এখানে কপালভাতি বিবৃত হইল। ঘেরণ্ড সংহিতায় ইহার কিঞ্চিৎ ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়।

কপালভাতিতে যে সূক্ষ্ম কম্পন-তরঙ্গ সৃষ্ট হয় তাহা তাহারা সহজে অনুভব করেন, যাহাদের অজ্ঞাতসারে. মূলবন্ধ স্বতঃই হইয়া থাকে। কম্পন-তরঙ্গ যতই প্রবল হয় ততই সমগ্র বস্তিদেশ আপনা হইতে সঙ্কুচিত হয় এবং ইহার ফলে মূলবন্ধ সৃষ্ট হয়। অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় মূলবন্ধ স্বেচ্ছায় না করাই উচিত। উন্নত মেরুদণ্ড সম্বন্ধে যাহা উজ্জায়ী প্রাণায়ামে বলা হইয়াছে তাহা সমান ভাবে কপাল-ভাতিতেও প্রযোজ্য।

স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে, কপালভাতি তলপেটের বা ডায়াফ্রামের একটি নিশ্বাস ব্যায়াম এবং ইহাতে দ্রুত পর্য্যায়ে বিরামহীন রেচক ও পূরক চলে। সুতরাং কপালভাতি কুম্ভক বর্জিত এবং রেচক-পূরক সংযুক্ত প্রাণায়াম। আবার ইহার রেচক ও পূরকের মধ্যে রেচকই অভ্যাসের প্রধান অংশ, পূরক গৌণ অংশ মাত্র। পূরক, কুম্ভক ও রেচকে একটি প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হয়। একবার কপালভাতিতে বহু সংখ্যক রেচক এবং অল্পসংখ্যক পূরক আছে; কিন্তু একটিও কুম্ভক নাই। অভ্যাসকারী যতবার বায়ু রেচনে সমর্থ ততবার রেচন করিবেন। এইরূপে একবার কপাল-ভাতিতে বহু শত সংখ্যক রেচক হইতে পারে। সুতরাং রেচকই কপালভাতির মুখ্য অঙ্গ।

যেমন উজ্জায়ী প্রাণায়ামে, তেমনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সকল নিশ্বাস ব্যায়ামে রেচক ওপূরক যথাসম্ভব সুগভীর করিতে হয়। বস্তুতঃ রোচক এত সুগভীর ও সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক যে, উহাতে এক সি. সি. অতিরিক্ত বায়ু ফুসফুসে থাকিবে না। তদ্রূপ পূরকও এত সম্পূর্ণ হওয়াপ্রয়োজন যে, আরএক সি. সি. অধিক বায়ু ফুসফুসে

যাইবে না। কিন্তু কপালভাতির কথা স্বতন্ত্র। কারণ, ইহাই একমাত্র নিশ্বাস ব্যায়াম, যাহাতে গভীর পূরক বা রেচক প্রয়োজন হয় না। তাহা হইলে কপালভাতিতে রেচকের পরিমাণ কত হওয়া উচিত? কপালভাতি রেচকে মাত্র ততটুকু বায়ু ফুসফুস হইতে বহির্গত হয়, যৎটুকু বায়ু তলপেটের সম্মুখস্থ শীগুলির একবার মাত্র অন্তর্মুখী সবেগ সঙ্কোচনে বাহিরে আসে। বিভিন্ন ব্যক্তির ফুসফুস হইতে বিভিন্ন পরিমাণ বায়ু এইভাবে নির্গত হয়। স্বামী কুবলয়ানন্দ তাঁহার যৌগিক গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্বাভাবিক প্রশ্বাসে ও কপালভাতির রেচকে কি পরিমাণ বায়ু বহির্গত হয়। তাঁহার মতে স্বাভাবিক প্রশ্বাস অপেক্ষা কপাল-ভাতির রেচন কিঞ্চিৎ গভীরতর। যদি কাহারও স্বাভাবিক প্রশ্বাসে ৪৮০ সি. সি. বায়ু নির্গত হয়, তাহার কপালভাতি রেচকে ৬০০ সি. সি. বায়ু বাহির হইবে। অবশ্য কার্য্যকালে প্রশ্বসিত বায়ুর উক্ত গাণিতিক পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। তলপেটের সঙ্কোচন সম্পূর্ণ হইলে বায়ুরেচন সহজভাবে চলিবে। যখন বায়ুরেচন স্বভাবতঃই বন্ধ হইবে তখনই কুম্ভক সমাপ্ত হয়। এই সরল বিধি অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রে সহজ ও নিরাপদ।

প্রকৃত পক্ষে কপালভাতি প্রাণায়াম না হইলেও ইহা উৎকৃষ্ট নিশ্বাস ব্যায়াম। সুতরাং প্রাণায়ামের স্থান, কাল, আসনাদির বিধি-গুলি ইহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কপালভাতি দাঁড়াইয়া করা অনুচিত। প্রত্যেক নিশ্বাস ব্যায়ামে তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি সংশ্লিষ্ট হয়। দণ্ডায়মান অবস্থায় এই সকল পেশী স্বাধীন ভাবে চালিত হয় না। সেইজন্য কোন নিশ্বাস ব্যায়াম দাঁড়াইয়া করা স্বাস্থ্যকর নহে।

কপালভাতিও বসিয়া করা উচিত। স্বামী কুবলয়ানন্দের মতে কপালভাতি পদ্মাসনে করাই প্রশস্ত। কারণ মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ইহা সজোরে অভ্যাস করিলে মানব দেহের প্রায় প্রত্যেকটি তন্তু (tissue) স্পন্দিত হয়। পদ্মাসন ব্যতীত অন্য কোন ধ্যানাসনে দেহের নিম্নাঙ্গগুলি এত দৃঢ়বদ্ধ থাকে না। কপালভাতি খুব জোরে অভ্যাস করিতে হয় বলিয়া অন্য কোন ধ্যানাসনে বসিলে পদদ্বয় প্রভৃতি আল্‌গা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা সমধিক।

হঠযোগ প্রদীপিকায় (২।৩৫) কপালভাতির নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায় :—

ভস্ত্রাবল্লোহকারস্য রেচপূরৌ সসম্ভ্রমৌ।
কপালভাতির্বিখ্যাতা কফদোষবিশোধিনী॥

অনুবাদ—লৌহকারের (কামারের) ভস্ত্রাবৎ (হাপরের মত) বায়ু গ্রহণ ও রেচন কপালভাতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অভ্যাসে কফজাত সর্বদোষ সারিয়া যায়।

পদ্মাসনে কপালভাতি অভ্যাস স্বাত্মারাম সূরীর অভিপ্রেত মনে হয়। যদিও তাঁহার অভিপ্রায় বাক্যে প্রকাশিত নহে, তথাপি ভস্ত্রিকা সম্বন্ধে তাঁহার নির্দেশ হইতে ইহা সহজে অনুমেয়। তিনি অন্যান্য প্রাণায়ামের বর্ণনাকালে কোন আসনের উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু ভস্ত্রিকা বর্ণনার পূর্বেই পদ্মাসনের বিবরণ দিয়াছেন । ইহা দ্বারা প্রতীত হয়, পদ্মাসনে ভস্ত্রিকা অভ্যাস তাঁহার অভিপ্রেত। কপাল-ভাতির সহিত ভস্ত্রিকার সৌসাদৃশ্য ইতিপূর্বে উল্লিখিত। সহজভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উজ্জায়ী কুম্ভকের সহিত কপালভাতি সংযুক্ত হইলে ভস্ত্রিকা হয়। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে সিদ্ধান্ত করা

যায়, ভাস্ত্রিকা ও কপালভাতি পক্ষে একই আসন অর্থাৎ পদ্মাসনই উপযোগী। অবশ্য কার্য্যতঃ ইহা স্বীকার্য্য যে, কপালভাতি সবেগে না করিলে ইহা যে কোন ধ্যানাসনে করা যায়। কাহারো কাহারো পক্ষে পদ্মাসনে বসা কষ্টকর। তাহারা যে কোন সুখকর আসনে উপবেশনপূর্বক কপালভাতি করিবেন। পদদ্বয়ের সংস্থানই পদ্মাসনের প্রধান অঙ্গ। স্বাত্মারাম পদ্মাসনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা নিঃসংশয়ে স্পষ্টীকৃত হয়। পদ্মাসনে অবস্থানপূর্বক কপালভাতি করিতে হইলে হস্তদ্বয় সংযুক্তভাবে তলপেটের সম্মুখে বিন্যস্ত হইবে; অথবা জ্ঞানমুদ্রাবদ্ধ হইয়া হাঁটুদ্বয়ের উপরে থাকিবে।

কপালভাতিতে পদ্মাসনের অঙ্গীভূত জালন্ধর বন্ধ ও মূলবন্ধের স্থান এখন আমাদের আলোচ্য। প্রাণায়ামে কুম্ভকের সময় জালন্ধর বন্ধ অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম, দেখা যায় মূর্চ্ছা কুম্ভকে। হঠযোগ প্রদীপিকায় (২।৬৮) আছে:—

পূরকান্তে গাঢ়তরং বদ্ধা জালন্ধরং শনৈঃ।
রেচয়েৎ মূর্চ্ছনাখ্যেয়ম্ কুম্ভকাম্॥

অনুবাদ—মূর্চ্ছনা কুম্ভিকায় (মূর্চ্ছা কুম্ভকে) জালন্ধর বন্ধ দৃঢ় করিয়া বায়ু পূরকান্তে ধীরে ধীরে রেচন করিতে হয়।

মূর্চ্ছা কুম্ভক ব্যতীত অন্যান্য সাত প্রকার কুম্ভকে জালন্ধর বন্ধে স্থিত হইয়া বায়ুরোধ করিতে হয়। কপালভাতি নিশ্বাস ব্যায়াম হইলেও ইহাতে কেবলমাত্র অবিরাম প্রশ্বাস আছে; কিন্তু কুম্ভক নাই। সুতরাং পদ্মাসনে কপালভাতি করিলেও জালন্ধর বন্ধ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য মূলবন্ধকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

প্রশ্বাস-বায়ুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণই রেচকের প্রধান উদ্দেশ্য নহে।

দেহযন্ত্রের যে যে অংশ ইহাতে প্রযুক্ত হয় সেগুলিকে নির্দিষ্ট অবস্থানে সন্নিবিষ্ট করাই ইহার প্রধান কাজ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কপালভাতি তলপেটের নিশ্বাস ব্যায়াম। সুতরাং ইহাতে পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী ও উপরস্থ পেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই রেচক সৃষ্ট হয়। রেচকের সংখ্যা যতই হউক না কেন, একবার কপালভাতি যতক্ষণ চলে ততক্ষণ পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী ও উপরস্থ পেশীগুলি সঙ্কুচিত থাকে। অন্যান্য যৌগিক নিশ্বাস ব্যায়ামে উক্ত পেশীসমূহ কেবলমাত্র পূরকে ও কুম্ভকে সঙ্কুচিত থাকে; কিন্তু যখন রেচক আরম্ভ হয় তখন সেগুলি শিথিল হইয়া যায় এবং রেচক গভীরতম হইলে পেশীর শৈথিল্য সম্পুর্ণ হয়। কিন্তু ইহাদের সহিত কপালভাতির পার্থক্য হেতু পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী ও উপরস্থ পেশীগুলি একবার সঙ্কুচিত হইলে ইহারা পঞ্জরাস্থিকে উত্থিত রাখিয়া রেচককালেও উক্ত অবস্থায় থাকে। ব্যায়ামকালে ডায়াফ্রাম এবং তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও শিথিল হয়। কপালভাতি রেচকে পঞ্জরাস্থি আদৌ নামে না, ইহা বক্তব্য নহে। বাস্তবিক পক্ষে পঞ্জরাস্থি একটুকুও না নামাইয়া বায়ুরেচন অসম্ভব। কিন্তু কপালভাতিতে পঞ্জরাস্থির অবতরণ সামান্যমাত্র। :থোরাক্সের বাহ্যিক অবস্থান দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। কপালভাতিতে ইহার আরোহণ বা অবতরণ উল্লেখযোগ্য নহে।

কপালভাতিতে তলপেটের পেশীসমূহ ও ডায়াফ্রামের ব্যায়াম হওয়ায় এইগুলি আকস্মিক ও সবেগ সঙ্কোচনে সমর্থ এবং নমনীয় থাকা প্রয়োজন। কপালভাতি রেচকে তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি সহসা সবেগে সঙ্কুচিত হইয়া তলপেটের ভিসেরাকে (vicera) ভিতরে

ঠেলিয়া দেয়। ভিসেরা উর্দ্ধে উঠিয়া শিথিলায়মান ডায়াফ্রামকে উপরে ঠেলিয়া তোলে। তখন ডায়াফ্রাম থোরাক্সেপ্রবিষ্ট হইয়া ফুসফুস্ হইতে কিঞ্চিৎ বায়ু বহিষ্কৃত করে। সঙ্কোচমান ফুসফুস্ থোরাক্সকে অধিক সঙ্কুচিত হইতে দেয় না বলিয়া কপালভাতি রেচক উজ্জায়ী রেচকের মত গভীর হয় না। কত বেগে ডায়াফ্রাম ও তলপেটের পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা উচিত তাহা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

উজ্জায়ীতে নাসারন্ধ্র আংশিকভাবে রুদ্ধ হয় ; কিন্তু কপালভাতিতে তাহা অনাবশ্যক। ইহার কারণ সম্যক্ সুস্পষ্ট। যে পরিমাণ বায়ু একবার কপালভাতি রেচকে প্রশ্বসিত হয় তাহা এত সহসা বহিষ্কৃত হয় যে, নাসরন্ধ্র, রুদ্ধ থাকিলে বায়ু নির্গমন ব্যাহত এবং রেচক অসম্পূর্ণ হইবে। হঠযোগ প্রদীপিকার মতে কপালভাতিতেও নাসারন্ধ্রের আংশিক সংকোচন আবশ্যক। কিন্তু উক্ত সংকোচন এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহার দ্বারা বায়ুর বহির্গমনে কোন ব্যাঘাত হয় না। কপালভাতিতে রেচক দ্রুত হইলেও সমভাবে চলিবে। বহির্গম্যমান বায়ুপ্রবাহকে উপযুক্ত পথ প্রদানার্থ নাসাপুটদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইবে। অবশ্য ইহার দ্বারা মুখের কোন বিকৃতি হইবে না। বায়ুর দ্রুত রেচনহেতু নিশ্চয়ই নাসিকার নিম্নতর প্রান্তে সামান্য ঘর্ষণ হয়। কিন্তু ইহাতে কিছু যায় আসে না। নাসারন্ধ্রের উক্তাংশ পুরু চামড়ায় ঢাকা থাকায় ঘর্ষণ দ্বারা তথায় কোন অনিষ্ট হইবে না।

কপালভাতি পূরকের রহস্য বুঝিতে হইলে স্বাভাবিক শ্বাসগতির সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। স্বভাবতঃ নিশ্বাস সচেষ্ট (active) এবং প্রশ্বাস নিশ্চেষ্ট (passive) হয়। স্বাভাবিক

নিশ্বাসে থোরাক্স কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠিয়া স্বীয় আভ্যন্তরীণ সামর্থ্য বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে তন্মধ্যস্থ বায়ুচাপ কমিয়া যাইয়া বাহিরের বায়ু টানিয়া আনে। এইরূপে যে পেশীগুলি পঞ্জরাস্থিসমূহের মধ্যে ও উপরে কার্য্য করে সেগুলি এবং ডায়াফ্রাম আনত হয়। আর স্বাভাবিক প্রশ্বাস নিশ্চেষ্ট ক্রিয়া মাত্র, ইহাতে উপরোক্ত পেশীসমূহ শিথিল হইয়া যায়। তাহার ফলে পঞ্জরাস্থি স্বতঃই নামিয়া আসে এবং ডায়াফ্রাম কিঞ্চিৎ উঠিয়া যায় এবং নমনীয় ফুস্‌ফুস্ স্বেচ্ছাপূর্বক সংকুচিত হয় ; কিন্তু তলপেটের আন্তর পেশীগুলি স্বাভাবিক প্রশ্বাসে এবং স্বাভাবিক নিশ্বাসে নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহারা প্রশ্বাসে সংকুচিত এবং নিশ্বাসে শিথিল হয়। সুতরাং ইহাদের কার্য্য পূর্বোক্ত পেশীসমূহের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র।

কপালভাতিতে তলপেটের পেশীসমূহের উত্তম ব্যায়াম হয় এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসকালে থোরাক্সের পেশীসমূহ সংকুচিত থাকে। ব্যায়ামান্তে থোরাক্সের পেশীসমূহ পুনরায় শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু তলপেটের পেশীসমূহ রেচকান্তে সংকুচিত থাকে এবং পূরকের সময় শিথিল হয়। পৈশিক শৈথিল্য নিশ্চেষ্ট অবস্থামাত্র। সুতরাং তলপেটের পেশীগুলিকে রেচকান্তে ছাড়িয়া দিলেই উহারা স্বাভাবিক শৈথিল্য প্রাপ্ত হয়।

আমরা এই পর্য্যন্ত একটি প্রধান পেশী ডায়াফ্রামের কোন আলোচনা করি নাই। উক্ত পেশীর ব্যবহার কিছু দূর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে আমাদের ইচ্ছাধীন। যেমন শ্বাসযন্ত্রের পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছার ঈঙ্গিত ব্যতীতও স্বাভাবিক কার্যে নিরত থাকে সেইরূপ ডায়াফ্রাম স্বকার্য্য সাধনে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। যখন আমরা

নিবিষ্ট মনে কার্য্যরত থাকি তখনও ইহা আমাদের চেতনার সহিত সংযুক্ত না হইয়াও স্বকার্য্য সাধন করে; কারণ ইহা স্বেচ্ছাধীন (voluntary) পেশী। কপালভাতি রেচকের শেষে শিথিল হইয়া আর একবার সঙ্কোচনের জন্য প্রস্তুত। উক্ত সঙ্কোচনের ফলে ডায়াফ্রামের অবতরণ ঘটে। ইহার ফলে থোরাক্সের লম্বমান ব্যাসার্ধ ও ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ সামর্থ্য বর্ধিত এবং ফুসফুসের বায়ু হ্রাস হওয়ায় বাহিরের বায়ু ভিতরে আসে। ফুসফুসের বায়ুচাপ বাড়িয়া বাহিরের বায়ুচাপের সহিত সমান হইলে রেচক আরম্ভ হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, কপালভাতি পূরকে আমাদের ইচ্ছাকৃত পৈশিক সঙ্কোচন আবশ্যক। তলপেটের পেশীগুলি শিথিল হইলেই পূরক আরম্ভ হয়। এই জন্যই পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কপালভাতি পূরক নিশ্চেষ্ট ক্রিয়ামাত্র।

কপালভাতি পূরক ও রেচকের মধ্যে অত্যধিক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ, ইহাতে রেচক আকস্মিক ও বেগমান এবং পূরক স্বাভাবিক ও শান্ত। বস্তুতঃ পরবর্তী প্রশ্বাসের জন্য বায়ু গ্রহণার্থ পূরক আবশ্যক। সুতরাং কপালভাতিতে রেচকই প্রধান ক্রিয়া। পরবর্তী রেচকে যত বায়ু পরিত্যক্ত হয় তৎপরবর্তী পূরকে তত বায়ু গৃহীত হয়; কিন্তু পূরক ও রেচকের সময় সমান নহে। যদি একটি রেচক ও একটি পূরকে আধ সেকেণ্ড লাগে স্থূলভাবে ইহা বলা যায় মোট সময়ের ⅓ অংশ মাত্র রেচকে এবং বাকী অংশ পূরকে লাগিবে। পূরকে শ্বাসনালী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে; ইহার কোনও অংশ সঙ্কুচিত থাকে না। সেইজন্য বাহিরের বায়ু সহজে স্বাভাবিক নিশ্বাসের ন্যায় ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়। সাধারণ নিশ্বাসের অল্পতম

সময় প্রায় দেড় সেকেণ্ড। কিন্তু যখন কপালভাতিতে প্রত্যেক মিনিটে ১২০ বার রেচন হয় তখন নিশ্বাসের পরিমাণ ½ সেকেণ্ড মাত্র। আবার কপালভাতি নিশ্বাসে সাধারণ সরল নিশ্বাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকতর বায়ু গৃহীত হয়। অতএব কপালভাতি নিশ্বাস এবং সাধারণ নিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সামান্য মাত্র।

রেচক ও পূরকের মধ্যে কোন বিরাম না থাকায় কপালভাতিতে কুম্ভকের স্থান নাই। ইহাতে রেচক সশব্দ, আকস্মিক ও বেগযুক্ত; আর পূরক নিঃশব্দ, স্বাভাবিক ও বেগরহিত। রেচকের সময় নাকে কামারের হাপরের মত অবিরাম শব্দ হয় বলিয়া ইহাকে হঠযোগ প্রদীপিকা লৌহকারের ভস্ত্রিকার সহিত তুলনা করিয়াছেন। রেচকের সংখ্যা এবং গতিও আমাদের আলোচ্য বিষয়। রেচকের সংখ্যা প্রথমে অল্প হওয়াই নিরাপদ। যাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল তাহারা এগার বার রেচক দ্বারা কপালভাতি আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ প্রত্যেক উপবেশনে সাধারণ পক্ষে তিনবার কপালভাতি করা উচিত। সকালে ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুইটি উপবেশন হইলে ভাল হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সপ্তাহে এগার বার রেচক বাড়াইয়া এগার সপ্তাহের মধ্যে ১২১ বার রেচক করা যায়। স্বামী কুবলয়ানন্দ সুস্থ এবং রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে উক্ত ব্যবস্থা দিয়া আশাতীত সুফল পাইয়াছেন।

প্রত্যেক কপালভাতি রেচকে আরম্ভ এবং পূরকে শেষ হইবে। দুই বার কপালভাতির মধ্যে কয়েকটি স্বাভাবিক নিশ্বাস চলিবে। স্বাভাবিক নিশ্বাসের গতি অত্যন্ত মন্থর ও সরল হইবে। এই সময়ে সাধারণতঃ শ্বাসযন্ত্রের এবং বিশেষতঃ তলপেটস্থ পেশীসমূহের বিশ্রাম

হয়। উক্ত সময়ের পরিমাণ স্বীয় সুবিধা অনুসারে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে উক্ত বিশ্রামের কাল আধ মিনিট হইতে এক মিনিট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই বিধান পর্য্যাপ্ত।

উপরে যে ব্যবস্থা দেওয়া হইল তাহা স্বাস্থ্যকামীর দৈনিক অভ্যাসের পক্ষে যথেষ্ট। স্বাস্থ্যকামী ইহার দ্বিগুণ অভ্যাস করিতেও পারেন। রেচকের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া কপালভাতির সংখ্যা ঠিক রাখা যায়; অথবা ইহার বারের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া রেচকের সংখ্যা ঠিক রাখা চলে। বলা বাহুল্য যে, পরবর্তী বিধান পূর্ববর্তী বিধান অপেক্ষা অল্পতর আয়াসসাপেক্ষ। কিন্তু ধর্মসাধক ইহা অপেক্ষা অনেক বেশীমাত্রায় কপালভাতি করিবেন। তাহার প্রত্যেক উপবেশনে প্রতিবারে তিন মিনিট করিয়া তিন বার কপালভাতি করা উচিত। উক্ত পরিমাণে উপস্থিত হইবার জন্য শ্বাসযন্ত্রকে অযথা ক্লান্ত করা বিপজ্জনক। প্রত্যেক বারের কাল যত দীর্ঘ হয় ততই সূক্ষ্ম কম্পন সৃষ্ট হয়। ধীর গতিতে শেষ সীমায় যাইতে হইবে।

কপালভাতির প্রত্যেক বায়ুরেচনে তলপেটের ভিসেরার উপর আন্তর ধাক্কা লাগে। উক্ত ধাক্কা নিম্ন তলপেটে অবস্থিত মূলাধারকে কম্পিত করে। এই স্নায়বিক কম্পনে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে বিপুল মানসিক শক্তি লাভ হয়। মেরুদণ্ডে মূলাধার প্রভৃতি যে ছয়টি স্নায়ুকেন্দ্র আছে তাহাদের যে কোনটি কপালভাতি অভ্যাসে সতেজ হইতে পারে। কিন্তু কেহ ছয় মাস, কেহ বা ছয় বৎসর অভ্যাসের পরে উক্ত ফল লাভ করেন। রেচক ও পূরকের সময়ে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী

কালেও মনে এই ভাবধারা চলিতে থাকিবে—আমার কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবুদ্ধা হইতেছেন।

স্বাস্থ্যকামী অন্য ভাবধারার উপর মনোযোগ দিতে পারেন। তাহার বিধান অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি ভাবিবেন যে, রেচক ও পূরকের সময়ে যথাক্রমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত এবং অক্সিজেন গৃহীত হইতেছে। সাধারণতঃ গৃহীত অক্সিজেনের পবিমাণ পবিত্যক্ত কার্বণ ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। তিনি আরও ভাবিবেন যে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ এবং অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা তাহার দেহের রক্ত বিশুদ্ধ এবং তজ্জন্য তন্তুসমূহ সুপুষ্ট হইতেছে। যোগশাস্ত্রে যাহাকে নাড়ীশুদ্ধি বলে তাহা কপালভাতির দ্বারা সহজে লাভ করা যায়।

কপালভাতির অক্সিজেন-মুল্য এত অধিক যে, অন্য কোন যৌগিক ব্যায়াম ইহার সমকক্ষ নহে। ইহার দ্বারা অদ্ভুত স্নায়ুপুষ্টি সাধিত হয়। দেহেব রক্তপ্রবাহ ও পরিপাকাদি ক্রিয়ার উপর ইহার গভীর প্রভাব পড়ে এবং তলপেটেব ভিসেরা প্রভৃতি যন্ত্রের উত্তম মর্দন হয়। ইহা স্বাস্থ্যকামীর দৈনিক ব্যায়াম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। ধর্মার্থীও ইহাতে স্বাস্থ্যকামী অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ কবেন। দেহের স্বাস্থ্য এবং মনের শক্তি উভয়ই তাঁহার করতলগত হয়। কপালভাতি অভ্যাসের দ্বারা সাধকের দেহ-মন অন্যান্য প্রাণায়ামের জন্য উপযুক্ত হয়। কার্বণ ডাই-অক্সাইড অপসারণ এবং অক্সিজেন সংমিশ্রণ হেতু দেহস্থ শোণিত-প্রবাহ ও স্নায়ুজাল এত শোধিত এবং সমৃদ্ধ হয় যে, সাধক রোগরাহিত্য, পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি অমূল্য সম্পদে মণ্ডিত হন।

সাধারণতঃ প্রাণায়াম অভ্যাসকারীদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এই যে, তাহাদের ফুসফুস নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা শ্বাস-কেন্দ্র কর্তৃক ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। উক্ত কেন্দ্রোত্থিত প্রবল উত্তেজনা আসিলে দ্রুত নিশ্বাস বা প্রশ্বাস বাধ্য হইয়া লইতে হয়। যদি শ্বাসকেন্দ্র এমন শান্তভাব ধারণ করে যে, ইহা হইতে মৃদুল উত্তেজনা উঠিবে, তাহা হইলে প্রাণায়ামের ব্যাঘাত সামান্য পরিমাণে হইবে এবং ইচ্ছামত পূরক, কুম্ভক ও রেচকের মাত্রা নির্ধারিত করা যাইবে। কপালভাতি অভ্যাসের দ্বারা শ্বাসকেন্দ্র অচিরে শান্তভাব ধারণ করে এবং তজ্জন্য সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী সাম্যভাবে সংস্থিত হয়। সেই হেতু কয়েকবার কপালভাতি করিবার পর প্রাণায়াম অভ্যাস সহজসাধ্য হয়। প্রাচীন যৌগিক বিধি অনুসারেও প্রত্যহ প্রাণায়াম আরম্ভ করিবার পূর্বে কপালভাতি অভ্যাস কর্তব্য।

কপালভাতিতে রেচন-বেগ কিরূপ হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিলে বর্তমান অধ্যায় সমাপ্ত হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মার নাই। প্রতি সেকেণ্ডে একবার রেচনই নিরাপদ সাধারণ পরিমাণ। যথাসময়ে প্রতি সেকেণ্ডে দুইবার রেচন সম্ভব হইবে। সাধারণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি এইরূপে মাত্রা বাড়াইয়া যখন প্রত্যেক মিনিটে ১২০ বার রেচনে সমর্থ হইবেন তখন তিনি বেগের শেষ সীমায় উপনীত হইবেন। যাহারা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা নিজেদের অধিকতর স্বাস্থ্যবান্ ও সহনশীল মনে করেন তাহারা অভ্যাসের ফলে প্রত্যেক মিনিটে দুইশতবার রেচন করিতে পারিবেন। উক্ত সীমা অতিক্রম করা কার্য্যতঃ অসম্ভব। কারণ, তখন রেচন এত অগভীর হয় যে, উহা আদৌ স্বাস্থ্যকর বা ফলপ্রদ হয় না।

কপালভাতি শ্রমসাধ্য যৌগিক ব্যায়াম এবং উজ্জায়ী অপেক্ষাও অধিক নির্দোষ। সুতরাং উহার মাত্রাদি নির্ধারণে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে এবং হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের দৌর্বল্য নাই তাহারা নির্ভয়ে কপালভাতি অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াইবেন। কপালভাতির অভ্যাস-কৌশল সহজ হইলেও প্রাণায়ামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদর্শনার্থ শারীর-তত্ত্বের আলোকে উহার এইরূপ বিশদ বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল।

মহামুদ্রা

যোগমুদ্রার ন্যায় মহামুদ্রাও একটী উত্তম যৌগিক ব্যায়াম। যোগমুদ্রার সচিত্র ও বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদত্ত। প্রত্যেক মুদ্রায় আসন ও প্রাণায়ামের যুগপৎ অভ্যাস সাধিত হয়। মহামুদ্রার বর্ণনা শিবসংহিতায় (৪।২৭—৩০) এইরূপ আছে।—

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরম্।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাম্॥
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারানি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি॥

চিত্তং চিত্তপদে দত্বা প্রভবেৎ বায়ুসাধনম্।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যস্যেৎ পুনঃ।
প্রাণায়ামং সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ ॥

অনুবাদ—গুরুদত্ত উপদেশ অনুসারে বাম গোড়ালী মলদ্বার ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী যোনিস্থানে (সীবনীতে) দৃঢ়বদ্ধ করিবেন। ডান পদ প্রসারিত করিয়া উহার অগ্রভাগ উভয় হস্তে ধরিবেন। চিবুক বুকে লাগাইয়া, দেহস্থ নব দ্বার বন্ধ করিয়া, ও চিত্ত স্থির রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। ইহাকে মহামুদ্রা বলে। সকল যোগশাস্ত্রে ইহার উপকারিতা বর্ণিত। বাম অঙ্গে অভ্যাসের পর ডান অঙ্গে অভ্যাস করিবেন। উভয় দিকে সমান বার অভ্যাস বিধেয়। সংযত চিত্তে মহামুদ্রা অভ্যাস কর্ত্তব্য।

মহামুদ্রার উপকারিতা শিব সংহিতায় (৪।৩১—৩৪) এইরূপে বর্ণিত।—

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিধ্যতি।
সর্বাসামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণম্ ॥
জীবনং তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনম্।
কুণ্ডলীতাপনং বায়োর্ব্রহ্মরন্ধ্র-প্রবেশনম্ ॥
সর্বরোগপ্রশমনং জঠরাগ্নি-বিবর্ধনম্
বপুষা কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনম্ ॥
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণম্।
এতদুক্তানি সর্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ ॥

অনুবাদ—উক্ত বিধি দ্বারা মন্দভাগ্য সাধকও মহামুদ্রায় সিদ্ধিলাভ করেন। মহামুদ্রার ফলে সকল নাড়ী পরিপুষ্ট হয়, বীর্য্যক্ষয় বন্ধ হয়, দীর্ঘ জীবন লাভ হয় এবং জরার কারণ বিনষ্ট হয়। ইহাতে প্রসুপ্তা শক্তি জাগ্রতা হন, প্রাণবায়ু সুষুম্না পথে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে ও সর্ব রোগ বিনষ্ট ও জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়। দেহের বিমলা কান্তি লাভ হয় এবং অকাল জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হয়। বাঞ্ছিত ফল সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়বর্গ বশীভূত হয়। মহামুদ্রার নিয়মিত অভ্যাসকারী সাধক উপরোক্ত ফলসমূহ নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক মুদ্রায় সঙ্কুচিত পেশীসমূহের বিশেষ অবস্থান দ্বারা ব্যায়াম হয়। ইহাকে আসন ও প্রাণায়ামের সংযুক্ত ব্যায়াম বলা যাইতে পারে। মহামুদ্রাকে চার অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ যথাক্রমে সিদ্ধাসন, পশ্চিমোত্তান এবং উজ্জায়ীর সদৃশ এবং চতুর্থ অংশ মূলবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ ও জালন্ধরবন্ধের যুগপৎ অভ্যাসের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। মহামুদ্রার প্রথম অংশ সিদ্ধাসনের সেই অংশের সদৃশ, যাহাতে সীবনীর উপর একটি গোড়ালী লাগাইতে হয়। প্রথমে পদদ্বয় পাশাপাশি প্রসারিত করিয়া বসিবেন। তৎপর বামপদ হাঁটুতে ভাঁজ করিয়া উহার গোড়ালী সীবনীতে ডান হাতের সাহায্য লাগাইবেন। বাম গোড়ালী যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে হইলে বাম হস্তে অণ্ডকোষাদি তুলিয়া ধরিবেন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে গোড়ালী ও সীবনীর মধ্যে অণ্ডকোষের কোন অংশ আবদ্ধ না হয়। বাম পদতল ডান উরুতে সংযুক্ত থাকিবে। গোড়ালীর উপর বসিবার চেষ্টা করিবেন না। উক্ত প্রণালী ভ্রান্ত। কারণ,

গোড়ালীর চাপ সীবনীর উপর দিতে হইবে, মলদ্বারের উপর নহে। সীবনীর দুই পার্শ্বে যে মোটা হাড়গুলি আছে, সম্বদ্ধ গোড়ালী তখন উহাদের কঠিন স্পর্শ অনুভব করিবে।

বামপদ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার পর জননেন্দ্রিয়াদি নিরাপদে রাখা আবশ্যক। ইহাতেই মহামুদ্রার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হইল। মহামুদ্রার দ্বিতীয় অংশ পশ্চিমোত্তান আসন সদৃশ। ইহাতে প্রসারিত পদের অগ্রভাগ যুক্ত করে ধরিবেন। তখন দেহকাণ্ড প্রসারিত পদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। যুক্তকর দ্বারা ডান পদের অগ্রভাগ বিধৃত থাকায় ডান হাঁটুর উপর মৃদু অথচ দৃঢ় টান পড়িবে। ইহাতে ডান পদ সম্পূর্ণরূপে সোজা থাকিবে এবং উহার পশ্চাৎ পেশীগুলির উপর চাপ পড়িবে। ডান হাঁটু বাঁকিয়া থাকিলে কোমরে ও তলপেটে চাপের অল্পতাহেতু মহামুদ্রার পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে না।

সাধারণতঃ উন্নত যোগসাধকের পক্ষে মহামুদ্রা অভ্যাস বিধেয় হইলেও স্বাস্থ্যকামী ইহা নিশ্চয়ই অভ্যাস করিতে পারেন। স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে মহামুদ্রার উপরোক্ত প্রণালীতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক। পশ্চিমোত্তান আসন বর্ণনাকালে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সেইগুলি মহামুদ্রার পক্ষেও প্রযোজ্য। হাঁটুর পশ্চাতে যে পেশীগুলি অবস্থিত তাহাদিগকে হ্যামষ্ট্রীং (hamstring) বলে। এইগুলি সঙ্কুচিত হইলে হাঁটু বাঁকান সম্ভব নয়। অনেকের পায়ের এই পেশীগুলি যথেষ্ট নমনীয় থাকে না। তাহারা যখন প্রসারিত পদের উপর ঝুঁকিয়া পড়েন তখন উক্ত পদের হাঁটু উঠিয়া যায়। কিছু কাল অভ্যাসের পরে উক্ত পেশীগুলি নমনীয় হইয়া উঠে। তখন হাঁটু বক্রতা-মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে সরল হইতে পারে। যাহাদের বয়স

অধিক হইয়াছে বা যাহারা অকাল বার্ধক্যে উপনীত তাহাদের উক্ত পেশীগুলি সহজে বক্রতামুক্ত হয় না। তাহাদের পক্ষে পা সোজা রাখিয়া কোমর বাঁকান কষ্টকর। তাহাদের মেরুদণ্ড এত শক্ত যে, তাহারা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া করাঙ্গুলি দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ ধরিতে পারেন না।

এই সকল ব্যক্তির উক্ত বিষয়ে অধীর হইবার কারণ নাই। তাহারাও ধীর অথচ দৃঢ় ভাবে মহামুদ্রা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন। যুক্ত করে পদপ্রান্ত ধরিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা হাঁটু বা তন্নিম্নে ও গোড়ালীর উপরে কোন স্থান ধরিবেন। এইরূপে অধিক আয়াস না করিয়াই তাহারা কটিদেশ সম্মুখ দিকে বাঁকাইতে পারিবেন, কিন্তু হাঁটু সর্বদা শক্ত ও সোজা রাখিতে হইবে। এই সামান্য বক্রতা কিছুক্ষণ রক্ষা করিলে আবশ্যকীয় নমনীয়তা অনতিবিলম্বে নিশ্চয়ই লাভ হইবে। মৃদু বা উগ্র ঝাঁকুনি দেওয়া একেবারে ছাড়িতে হইবে। কয়েক দিনের মধ্যে মেরুদণ্ডে এবং হ্যাম্‌ষ্ট্রীং (hamstring) পেশী-গুলিতে অধিকতর নমনীয়তার লক্ষণ দেখা যাইবে। যখন হস্তদ্বয় আরো সম্মুখে বাড়ান সম্ভব হইবে তখন পশ্চাতের পেশীগুলিকে প্রসারিত করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ ধরিবার চেষ্টা সফল হইবে। পৈশিক নমনীয়তা ধীরে ধীরে বাড়িবে এবং শেষ কালে মহামুদ্রা অভ্যাস সম্ভবপর ও সুখকর হইবে। ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিয়মিত ও সময়মত অভ্যাস দ্বারা সকল অসুবিধা অতিক্রান্ত হয়।

গোড়ালী সীবনিতে স্থাপন এবং যুক্ত করে পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ দ্বারা মহামুদ্রার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ পূর্ণ হইবে। এখন তৃতীয় অংশ অভ্যাসের চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয় অংশের সহিত উজ্জায়ীর

সাদৃশ্য আছে। ইহাতে সূর্য্যভেদন প্রাণায়ামের পূরক ও রেচক চলিতে পারে। তবে উজ্জায়ী বা সূর্য্যভেদনের পূরক ও রেচক দুই নাকে করিতে হইবে। তৃতীয় অংশে তলপেটের পেশীগুলি সযত্নে সংযত করিয়া দুই নাক দিয়া গভীর নিশ্বাস লইবেন। নিশ্বাসগ্রহণ সম্পূর্ণ হইলে কুম্ভকের জন্য আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র বন্ধ করিবেন। প্রসারিত পদের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলে তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়। পদাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া সজোরে টান দিলে উক্ত সঙ্কোচন আরও বর্ধিত হয়। সেইজন্য নিশ্বাস গ্রহণকালে তলপেটের স্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না ; ডায়াফ্রামের সবেগ অবতরণ এবং তজ্জন্য তলপেটের ভিসেরা সঞ্চালনের ফলে তলপেটের স্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য অভ্যাসকারী এই দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

নিশ্বাস গ্রহণান্তে আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র* বন্ধ করিলে মহামুদ্রার শেষাংশ আরম্ভ হয়। এই অংশের বন্ধত্রয় যুগপৎ কুম্ভকের সহিত অভ্যাস করা আবশ্যক। মূলবন্ধে একটী গোড়ালী সীবনীতে চাপ দেয় এবং সজোরে মলদ্বারাদি সঙ্কুচিত করিতে হয়। জলান্ধর বন্ধে চিবুক কণ্ঠকূপে বা উহার চার আঙ্গুল নিম্নে লাগাইতে হয়। উড্ডীয়ান বন্ধে গভীরতম প্রশ্বাসের পরে আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র বন্ধ রাখিয়া এবং পঞ্জর ও ডায়াফ্রাম তুলিয়া কৃত্রিম (mock) নিশ্বাস লইতে হয়। উজ্জায়ী ও ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম বর্ণনাকালে আমরা দেখিয়াছি, কিরূপে কুম্ভক সহ জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করিতে হয়।

---

* কোন দুর্গন্ধ আসিলে হস্ত দ্বারা নাক বন্ধ না করিয়া অভ্যন্তরে যাহা বন্ধ রাখিলে বায়ু প্রবিষ্ট বা বহির্গত হয়না তাহাই glottis অর্থাৎ আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র।

আমরা জানি, সাধারণতঃ প্রশ্বাসের পরই উড্ডীয়ান বন্ধ করিতে হয়; কিন্তু কুম্ভককালে কিরূপে উড্ডীয়ান করিতে হয় তাহা এখনও আমাদের অজ্ঞাত। উড্ডীয়ানের তিনটি প্রধান অঙ্গ আছে। প্রথমাঙ্গে গ্রীবা ও স্কন্ধদ্বয় শক্ত থাকে; দ্বিতীয় অঙ্গে যথাসম্ভব গভীর প্রশ্বাসের পরে সজোরে কৃত্রিম নিশ্বাস লইতে হয় এবং শেষ অঙ্গে তলপেটের সম্মুখস্থ সঙ্কুচিত পেশীগুলি শিথিলীকৃত হয়। এই তিনটি অঙ্গের যুগপৎ অভ্যাস কর্তব্য। মহামুদ্রার অঙ্গরূপে যে উড্ডীয়ান অভ্যাস করিতে হয় তাহাতে উপরোক্ত অঙ্গত্রয় বিদ্যমান। কেবলমাত্র উহাতে ফুসফুসের কার্য্যের প্রভেদ দেখা যায়। সাধারণ উড্ডীয়ানে প্রশ্বাসের পর কৃত্রিম নিশ্বাস লইতে হয়; কিন্তু মহামুদ্রার অঙ্গীভূত উড্ডীয়ানে নিশ্বাসেব পর কৃত্রিম নিশ্বাসের চেষ্টা করিতে হয়।

যুক্ত করে পদাঙ্গুলিসমূহ ধরিয়া দৃঢ়ভাবে টানিলেই গ্রীবা ও স্কন্ধদ্বয় শক্ত হইয়া যায়। তখন ঘাড়ের ও তলপেটের পেশীগুলির সাহায্যে পঞ্জরদেশ তুলিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুম্ভকের জন্য ইতঃপূর্বে নিশ্বাস লওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ পঞ্জর পূর্বেই কিঞ্চিৎ উত্থিত আছে। কেবলমাত্র নিশ্বাস ক্রিয়ায় দ্বারা যে পঞ্জরোত্থান হয় তাহা সম্পূর্ণ নহে। যুক্ত করে পদপ্রান্ত ধরিয়া ঘাড় ও স্কন্ধদ্বয় দৃঢ় করিলে পঞ্জরোত্থান পূর্ণাঙ্গ হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা উত্থিত পঞ্জরের অধিকতর উত্থানের সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়। অধিকতর পঞ্জরোত্থানের ফলে থোরাক্স আরও উন্মুক্ত হয়এবং যদি আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র খোলা থাকে ও অভ্যাসকারী যদি ইচ্ছা করেন তবে অতিরিক্ত বায়ু গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অধিকতর পঞ্জরোত্থানের উদ্দেশ্য অধিকতর বায়ু গ্রহণ নহে। কারণ তাহাতে ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ বায়ুচাপ কমিয়া যায়। সুতরাং

আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র বন্ধ রাখিতে হইবে এবং অতিরিক্ত বায়ু আদৌ ফুসফুসে প্রবেশ করিবে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, পঞ্জরের অধিকতর উত্থান অত্যন্ত অল্প বলিয়া ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ বায়ু-চাপ অতি অল্পই কমে।

সাধারণ উড্ডীয়ানে তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলির শৈথিল্য উহাদের সম্পূর্ণ সঙ্কোচনের পরবর্তী। কিন্তু আলোচ্য উড্ডীয়ানে সম্পূর্ণ সঙ্কোচনের পূর্বে পৈশিক শৈথিল্য সৃষ্ট হয়। অবশ্য উক্ত শৈথিল্য নানা কারণে অসম্পূর্ণ থাকে। ইহার ফলে তলপেটের পেশীগুলি কুম্ভক সহ মূলবন্ধ ও জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস অপেক্ষা আরও সজোরে সঙ্কুচিত থাকে। সেইজন্য তলপেটের এবং ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ বায়ুচাপ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সাধারণ প্রাণায়ামে উভয় স্থানের বায়ুচাপ হ্রাস পায়। প্রাণায়ামে বায়ুচাপের পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে। বন্ধত্রয় সহ সম্পূর্ণ মহামুদ্রা কিরূপে করিতে হয় তাহার প্রথম বর্ণনা প্রদর্শিত। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়, মহামুদ্রা চারি অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ সীবনীতে গোড়ালী দৃঢ়ভাবে স্থাপন; দ্বিতীয়তঃ যুক্ত করে প্রসারিত পদপ্রান্ত ধারণ; তৃতীয়তঃ কুম্ভক দ্বারা বায়ুরোধ এবং চতুর্থতঃ বন্ধত্রয়ের যুগপৎ অভ্যাস। সংযুক্ত পশ্চিমোত্তান ও সিদ্ধাসনে বন্ধত্রয়ের সহিত প্রাণায়াম অভ্যাসকে সংক্ষেপে মহামুদ্রা বলা যাইতে পারে।

মহামুদ্রা প্রাণায়ামের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ইহার মাত্রা নির্ধারণ অতি সহজ। যতক্ষণ কুম্ভক চলে ততক্ষণ মহামুদ্রা থাকে। ইহার অর্থ, কুম্ভকের মাত্রাই এই মুদ্রার মাত্রা। যদি কেহ ত্রিশ সেকেণ্ড কুম্ভক করেন তাহার পক্ষে মহামুদ্রা অভ্যাসের সময় হইবে ত্রিশ

সেকেণ্ড মাত্র। মহামুদ্রার ন্যায় বন্ধত্রয়ের সহিত পশ্চিমোত্তান আসনে কুম্ভক অভ্যাস অপেক্ষা কোন ধ্যানাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বন্ধত্রয়-বর্জ্জিত কুম্ভক অভ্যাস অধিকতর সহজ ও শুভকর। সেইজন্য সাধারণ কুম্ভকের মাত্রা অপেক্ষা মহামুদ্রায় কুম্ভকমাত্রা ক্ষুদ্রতম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যিনি ত্রিশ সেকেণ্ড সাধারণ কুম্ভক করিতে পারেন তিনি মহামুদ্রায় ১৫ সেকেণ্ড মাত্র কুম্ভক করিবেন। কুম্ভকান্তে মহামুদ্রার অভ্যাস সমাপ্ত হয়। প্রথমে মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ যুগপৎ খুলিয়া তৎপরে জালন্ধর বন্ধ ছাড়িবেন। তৎপরে ঘাড় সোজা করিয়া ও আভ্যন্তর নাসারন্ধ্র খুলিয়া ধীরে ধীরে অথচ গভীরভাবে ফুসফুসের নিরুদ্ধ বায়ু ত্যাগ করিবেন। মহামুদ্রায় যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হয় তাহা আসল প্রাণায়ামের অঙ্গীভূত না হইলেও প্রাণায়ামের সাধারণ বিধি ইহাতে প্রযোজ্য। ইহার অর্থ, ইহাতে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের অনুপাত ১ : ২ : ২ অথবা ১ : ৪ : ২ হইবে।

একটি প্রাণায়ামের অব্যবহিত পরে আর একটি প্রাণায়াম বন্ধত্রয় সহ অভ্যাস করিবেন; কিংবা পরবর্ত্তী প্রাণায়াম অভ্যাসের পূর্ব্বে কয়েকটি সাধারণ নিশ্বাস লইবেন—ইহা অভ্যাসকারীর সামর্থ্য ও আগ্রহের উপর নির্ভর করে। আবশ্যক হইলে তিনি একটি প্রাণায়ামের পরে পদের অগ্রভাগ ছাড়িয়া ও হাঁটু আল্‌গা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পদের অগ্রভাগ ধরিয়া এবং স্বাভাবিক নিশ্বাস না লইয়া বার বার প্রাণায়াম করিলে ফললাভ দ্রুততর ও অধিকতর হয়। মহামুদ্রার জন্য অভ্যাসকারী যে শক্তি ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন উহার অর্দ্ধেক ব্যয়িত হইলে তিনি হাত পা ছাড়িয়া স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুক্ষ

বিশ্রাম করিবেন এবং অবশিষ্ট শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইবেন। শক্তির প্রথমার্ধ যে ভাবে ব্যয়িত হইয়াছিল শেষার্ধও সেই ভাবে ব্যয় করিতে হইবে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমার্ধে বাম গোড়ালী সবীনীতে সংলগ্ন ছিল; কিন্তু শেষার্ধে ডান গোড়ালী উক্ত স্থানে সম্বদ্ধ হইবে। শেষার্ধে ডান গোড়ালী আবদ্ধ থাকায় বাম পদ প্রসারিত হইবে এবং উহার অগ্রভাগ যুক্ত করে ধরিতে হইবে। অবশিষ্ট অংশ উভয়ার্ধেই একরূপ, উভয় অর্ধে'ই কুম্ভকের সংখ্যা সমান হওয়া আবশ্যক। উভয়ার্ধের অভ্যাস শেষ হইলে মহামুদ্রা সমাপ্ত হয়।

মহামুদ্রার যে বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইল তাহা মালসারের মহাযোগী পরমহংস মাধবদাস কর্তৃক উপদিষ্ট। এখন আমরা হঠযোগ প্রদীপিকা অনুসারে মহামুদ্রা আলোচনা করিব। উক্ত যোগশাস্ত্রের রচয়িতা স্বাত্মারাম সূরী মহামুদ্রার কুম্ভক কালে তিনটী বন্ধের পরিবর্তে দুইটি মাত্র বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি মহামুদ্রায় উড্ডীয়ান বন্ধের উল্লেখ করেন নাই। তৎগ্রন্থের টীকাকার ব্রহ্মানন্দ সম্ভবতঃ ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগী ছিলেন। তিনি স্বাত্মারাম ও মাধবদাস উভয় যোগ-বিশেষজ্ঞ হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ে স্বাত্মারামের মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রসারিত পদের সমগ্র প্রান্তের পরিবর্তে তিনি পদাঙ্গুষ্ঠ মাত্র ধরিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন, যুক্ত করের বদলে তর্জনী যুগলের শৃঙ্খল ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ কুম্ভকের সহিত জিহ্বা বন্ধ বন্ধত্রয়ের পরিবর্তে অনুষ্ঠেয়। হঠযোগের আর একটী প্রধান শাস্ত্র ঘেরণ্ড সংহিতার মধ্যে ভ্রূমধ্য দৃষ্টির সহিত জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস কর্তব্য, হঠযোগের তৃতীয় প্রামাণ্য

গ্রন্থ শিব সংহিতায় ভ্রূমধ্য দৃষ্টি ব্যতীত জালন্ধর বন্ধের অভ্যাস উপদিষ্ট। ইহাতে মহমুদ্রায় মূল বন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ করিতে বলা হয় নাই। যুক্ত করে পদপ্রান্ত বা তর্জনীদ্বয় দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরিতে হইবে, ইহা ঘেরণ্ড সংহিতায় স্পষ্ট ভাবে উক্ত হয় নাই। উক্ত যোগশাস্ত্রে আছে, "করে ধৃত পদাঙ্গুলী"; অর্থাৎ হাতে পদাঙ্গুলি ধরিয়া। স্বামী কুবলয়ানন্দ স্বীয় গুরু মাধব দাসজীর অভিমত সমর্থন পূর্বক বলেন, "উক্ত উদ্ধৃতিতে 'করে'র স্থলে 'করয়োঃ' হওয়া উচিত। কারণ সংযুক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা পদাগ্র না ধরিলে প্রসারিত পদের পশ্চাৎ পেশীগুলির উপর পুরা টান পড়িবে না।" তাঁহার অভিমত এই যে মাধবদাসের নির্দেশই হঠযোগ প্রদীপিকা বা ঘেরণ্ড সংহিতা বা শিব সংহিতার নির্দেশ অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। মাধবদাসজী ব্যতীত অন্য কেহই উড্ডীয়ানকে মহামুদ্রার অঙ্গীভূত করেন নাই। অথচ উড্ডীয়ান ব্যতীত মহামুদ্রা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। মাধব দাসজীর মতানুসারে মহামুদ্রা উড্ডীয়ান সহ অভ্যাস কষ্টকর হইলেও অধিকতর ফলপ্রদ।

এখন মহামুদ্রার উপকারিতা আলোচনা করা হইবে। শারীর তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, স্নায়ুমণ্ডলীকে সুস্থ ও পুষ্ট করাই মহামুদ্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সকল পেশীতে স্নায়ুসমূহ প্রোথিত সেইগুলির ব্যায়াম অথবা ভিসেরার চাপের পরিবর্ত্তন দ্বারা স্নায়ু মণ্ডলীতে অধিকতর রক্তপ্রবাহ বাড়াইয়া উক্ত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয়। মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সংখ্যাতীত স্নায়ুকোষ (nerve-cells) অবস্থিত। স্নায়ুসমূহ (nerves) দ্বারা স্নায়ুশক্তি (nerve energy) বাহিত হয়, উৎপন্ন হয় না। স্নায়ুকোষ গুলিতে সমস্ত স্নায়ু শক্তি সৃষ্ট

হয়। স্নায়ুকোষসমূহে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি দ্বারাই স্নায়ুশক্তি বাড়ে। সুতরাং স্নায়ুকোষের স্বাস্থ্যরক্ষা মূলতঃ আবশ্যক।

অসংখ্য স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কে অবস্থিত। এখন দেখা যাক কিরূপে মহামুদ্রা অতিরিক্ত শিরাবাহিত রক্ত মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। প্রধান মহাশিরা মস্তিষ্ক হইতে দূষিত রক্ত নীচে টানিয়া আনে। সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা মহামুদ্রায় মস্তিষ্ক হইতে দূষিত রক্ত অপসারণ দ্রুততর হয়। ইহার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত-প্রবাহ বর্ধিত এবং তজ্জন্য তত্রস্থ স্নায়ুকোষগুলি রক্তস্নাত হয়। গ্রীবাদেশে ও মেরুদণ্ডে যে সকল স্নায়ুকেন্দ্র আছে সেগুলিও মহামুদ্রায় ব্যায়াম লাভ করে। পশ্চিমোত্তান আসনের ন্যায় মহামুদ্রায় মেরুদণ্ডের যে অগ্রমুখী বক্রতা হয় তাহা জালন্ধর বন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ দ্বারা বর্ধিত হয়। এই বন্ধদ্বয়হেতু মেরুদণ্ডের পার্শ্ববর্তী পেশীসমূহ পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও শিথিলীকৃত হয়। ইহার ফলে উপরোক্ত পেশীসমূহে অবস্থিত তন্তুগুলি অধিকতর রক্ত-প্রবাহ পায়। পেশীসমূহের পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচন ও শিথিলীকরণ দ্বারা মেরুদণ্ডের নিম্নদেশস্থ স্নায়ুগুলিও সতেজ হইয়া উঠে।

মহামুদ্রার কুম্ভকে তলপেটে যে আভ্যন্তরীণ চাপ উৎপন্ন হয় তাহা উড্ডীয়ান বন্ধ দ্বারা আরও বাড়ে। তলপেটে উচ্চতর চাপ হেতু অপ্রধান মহাশিরার দ্বারা তলপেটের দূষিত রক্ত নিঃশেষে হৃৎপিণ্ড-গামী হয়। ইহার ফলে অধিকতর শিরাবাহিত রক্ত তলপেটে আসিয়া স্থানীয় যন্ত্রগুলিকে সবল করে। এইরূপে যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয়, উদর এবং অন্ত্রদ্বয় অধিকতর স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মহামুদ্রায় তলপেটের ডান ও বাম পৈশিক সঙ্কোচনের

তীব্রতা (Intensity) থাকে না। পদদ্বয়ের অবস্থান দ্বারাই প্রধানতঃ তলপেটের পেশীগুলি প্রভাবিত হয়। যখন বাম পদ ভাজ করা থাকে এবং ডান পদ প্রসারিত হয় তখন তলপেটের ডান দিকের পেশীগুলি বাম দিকের পেশীগুলি অপেক্ষা অধিকতর সঙ্কুচিত হয়। তলপেটের ডান ও বাম অংশে পৈশিক সঙ্কোচনের প্রভেদ দ্বারা ডায়াফ্রামে ডান ও বাম দিক অধিকতর সক্রিয় হয়। নিশ্বাসকালে ডায়াফ্রামের ডান দিক বাম দিকের মত সহজ ভাবে নামিয়া আসে না। ইহার ফলে বাম ফুসফুস ডান ফুসফুস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিশ্বসিত বায়ুধারণ করিতে সমর্থ হয়। আশ্চর্য্য এই যে, হঠযোগ প্রদীপিকার টীকাকার ব্রহ্মানন্দ শারীরতত্ত্বের উক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যটি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "অস্মিন্নভ্যাসে পূরিতো বায়ুর্বামাঙ্গে তিষ্ঠতি"। ইহার অর্থ, বাম পদ ভাঁজ করিয়া মহামুদ্রা অভ্যাস করিলে নিশ্বসিত বায়ু বাম ফুসফুসে সঞ্চিত হয়। তলপেটের এবং থোরাক্সের পেশীগুলি এবং সমগ্র শরীরের পশ্চাৎভাগের পেশীগুলি মহামুদ্রায় সম্যক প্রসারিত হয়।

এতক্ষণ আমরা শারীর তত্ত্বের আলোকে আলোচনা করিয়া দেখিলাম, মহামুদ্রা স্বাস্থ্যকর যৌগিক ব্যায়াম; কিন্তু হঠযোগ শাস্ত্রে মহামুদ্রা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ব্যায়ামরূপে ব্যাখ্যাত। ইহার দ্বারা দেহ-মনের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়। সিদ্ধাসন, পশ্চিমোত্তান আসন, প্রাণায়াম এবং ত্রিবন্ধ এই চারিটি ব্যায়ামের সংযুক্তঅভ্যাসকে মহামুদ্রা বলা হয়। আবার ত্রিবন্ধ অর্থাৎ বন্ধত্রয়কে পৃথক্‌ভাবে ধরিলে ছয়টি ব্যায়ামের যুগপৎ অভ্যাসকে মহামুদ্রা বলা চলে। পৃথক্‌ভাবে এই সকল যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করা অপেক্ষা

একত্র করিলে অধিক ফল লাভ হয়। সিদ্ধাসনে সীবনীতে গোড়ালীর যে চাপ পড়ে মহামুদ্রায় তাহা দেহের অগ্রমুখী বক্রতার দ্বারা তীব্রতর হয়। পশ্চিমোত্তান আসনে দেহের সম্মুখীন বক্রতা মহামুদ্রায় জালন্ধর বন্ধহেতু আরও বর্ধিত হয়।

বন্ধত্রয় সহ অভ্যাসের নিমিত্ত মহামুদ্রার কুম্ভক তীব্রতর হয়। পশ্চিমোত্তান এবং কুম্ভক সহযোগে বন্ধত্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহাদের তীব্রতা বহু গুণে বাড়ে। এতগুলি ব্যায়ামের তীব্রতা যুগপৎ বর্ধিত হওয়ায় মহামুদ্রা অভ্যাসে সুতীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এইজন্য স্বামী কুবলয়ানন্দ মহামুদ্রার অভ্যাস-ক্রম এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। অভ্যাসকারী সিদ্ধাসন ও পশ্চিমোত্তান দিয়া আরম্ভ করিবেন। তৎপরে কুম্ভক-রহিত প্রাণায়াম এবং বন্ধত্রয়ের পৃথক্ অভ্যাস বিধেয়। এই সকল ব্যায়াম অভ্যস্ত হইলে তিনি সিদ্ধাসনে কুম্ভক এবং পশ্চিমোত্তানে রেচক ও পূরক করিবেন। কিছু কাল পরে পশ্চিমোত্তানে কুম্ভক করা যাইবে।

সিদ্ধাসনে ও পশ্চিমোত্তানে কুম্ভক অভ্যাস পৃথক্ পৃথক্ বন্ধের সহিত দীর্ঘ কাল করা আবশ্যক। অন্তত ছয় মাস এইরূপ অভ্যাস করা উচিত। ইহার পর কুম্ভকের সহিত বন্ধত্রয়ের সংযুক্ত অভ্যাস পদ্মাসনে কর্তব্য। ত্রিবন্ধের সহিত কুম্ভক দুই মাস করার পর মহামুদ্রার সম্পূর্ণ অভ্যাসে যোগ্যতা লাভ হয়। কুম্ভক সহ বন্ধত্রয় প্রাণায়াম বা মহামুদ্রার সঙ্গে করিতে হইলে প্রত্যহ ছয়টি কুম্ভক দ্বারা আরম্ভ করা ভাল। ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে কুম্ভকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৮০ পর্য্যন্ত উঠান যায়। অবশ্য উক্ত বিধি আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষেই প্রযোজ্য, স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে নহে।

সিংহমুদ্রা

ত্রিশিখী ব্রাহ্মণ উপনিষদে ৪৪ শ্লোকে আছে—

সীবনীং গুল্‌ফদেশেভ্যো নিপীড্য ব্যুৎক্রমেণ তু।
প্রসার্য্য জানুনোর্হস্তো আসনং সিংহরূপকম্ ॥

অনুবাদ—গোড়ালীযুগল আড়াআড়ি ভাবে সীবনীতে লাগাইয়া হাটুদ্বয়ের উপর হস্ত দুটী প্রসারিত করিলে সিংহাসন হয়।

সিংহাসন বন্ধাদি যুক্ত হইলে সিংহমুদ্রায় পরিণত হয়। সিংহমুদ্রায় সিংহের মত মুখ ব্যাদান ও জিহ্বা প্রসারণ করিতে হয় বলিয়া ইহার উক্ত নাম হইয়াছে। সিংহমুদ্রা এই ভাবে করিতে হয়। পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বসুন। তৎপরে যে কোন একটী পদ (ধরুন ডান পদ), হাঁটুর কাছে ভাঁজ করিয়া বাম পাছায় (left buttock) নীচে এমন ভাবে রাখুন, যাহাতে ডান গোড়ালীর উপর বিনা অসুবিধায় বসিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে হাতের সাহায্যে ডান গোড়ালী উর্দ্ধ মুখে রাখা দরকার এবং উত্তোলিত বাম হাঁটুর সহিত ডান পদ পাছার নীচে স্থাপিত হইবে। ইহা সাবধানে করণীয়। এতক্ষণ দেহভার ডান পাছার উপরেই স্থাপিত ছিল। ডান পদ সন্তোষজনক ভাবে বাম পাছার নীচে স্থাপিত হইলে ডান পাছা ভূমি হইতে তুলিয়া সমস্ত দেহ-ভার ডান গোড়ালীর উপর রাখিবেন। উপরোক্ত অবস্থানে ডান পদের উর্দ্ধমুখী গোড়ালী পশ্চাৎ দিক হইতে আংশিক ভাবে দেখা যাইবে এবং জানুর কিঞ্চিৎ দূরে উহার পদাঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত থাকিবে।

ডান পদের উপর উপবেশন সমাপ্ত হইলে বাম পদ ভাঁজ করিয়া ডান পদের নিম্নে আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া (crossing anteriorly) ডান পাছার নীচে বাম গোড়ালী এমন ভাবে স্থাপন করুন, যাহাতে উহার উপর স্বচ্ছন্দে বসিতে পারেন। ডান জানুর অদূরে বাম পদের অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত হইবে। এখন উভয় গোড়ালীর উপর সমান ভাবে ভর দিয়া বসিতে পারিবেন। প্রত্যেক যৌগিক ব্যায়াম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত অভ্যাস করা আবশ্যক। ইহার কষ্টকর অভ্যাস পূর্ণ ফল প্রসব করে না। সিংহমুদ্রার পূর্ণফল লাভ করিতে হইলে দেহভার জানুর উপর, বিশেষতঃ ভূমিতে হাঁটুদ্বরের উপর পড়িবে, দেহকাণ্ড সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকিবে এবং পাছা দুটী একটু উঠিবে। উহাতে বাহুদ্বয় ও তন্নিম্ন স্থানের পেশীগুলি শক্ত, কনুইদ্বয়ের সন্ধিস্থল সম্পূর্ণ প্রসারিত এবং করতলদ্বয় স্ব স্ব হাঁটুর উপর সম্যক্ বিস্তৃত হইবে। দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি সিংহের থাবার (paws) মত উন্মুক্ত দেখা যাইবে। কোমর ও পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও বক্ষঃস্থল প্রসারিত থাকিবে এবং স্কন্ধদ্বয়ের মৃদু চাপ হাঁটুদ্বয়ের উপর হস্তদ্বয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পড়িবে।

ইহার পরেই সিংহমুদ্রার মূলাংশ আরম্ভ করিতে হইবে। এখন সিংহের মত মুখ ব্যাদান এবং জিহ্বা লেলিহান ও দোদুল্যমান করা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব মুখ বিস্তৃত ও জিহ্বা প্রসারিত করিয়া দৃষ্টি নাসাগ্রে বা ভ্রূযুগলের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিবেন। তৎপর সাধারণতঃ জালন্ধর বন্ধ করিবেন। উক্ত বন্ধ ব্যতীতও সিংহমুদ্রা করা যায়। প্রথমে ডান পদ ভাঁজ করিয়া সিংহমুদ্রা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বাম পদ দিয়াও ইহা আরম্ভ করা যায়। তখন বাম পদ ডান

পদের নীচে ছিল। দ্বিতীয় প্রকার অবস্থানে বাম পদের নিম্নে ডান পদ থাকিবে।

সিংহমুদ্রায় প্রশ্বাস নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাস প্রধানতঃ মুখ দিয়া চলিবে। যে বায়ু নিঃশ্বাসে ফুসফুসে গৃহীত হয় বা প্রশ্বাসে পরিত্যক্ত হয় তাহা নাকের পরিবর্ত্তে মুখ দিয়া হইবে। নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাস ক্বচিৎ নাসাপথ দিয়া প্রবিষ্ট বা নির্গত করিবেন। স্বাস্থ্যকামীগণ প্রত্যহ যোগাসনগুলি অভ্যাসের শেষে সিংহমুদ্রা করিবেন। তিন মিনিটের অধিক উক্ত মুদ্রার অভ্যাস অনাবশ্যক। জিহ্বা-বন্ধের সহিত ইহা অভ্যাস করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। জিহ্বা-বন্ধ এই ভাবে করিবেন। জিহ্বার উপরিভাগ মুখগহ্বরের ঊর্ধে স্থিত তালুদেশে দৃঢ়ভাবে সংন্যস্ত করুণ। ইহাতে জিহ্বার তিন প্রান্ত ঊর্ধ দন্তপুংক্তির মধ্যে স্থাপিত হইবে। জিহ্বার মধ্যাংশ কঠিন তন্তুর দ্বারা নির্মিত। ইহার দ্বারা তালুদেশে চাপ দিতে হইবে। উত্তোলিত ও দৃঢ়ীকৃত জিহ্বার চাপ বিশেষ ভাবে অনুভূত করা যাইবে। সিংহমুদ্রায় লোল জিহ্বা করিবার পর জিহ্বা-বন্ধ অভ্যাস করিতে হয়। এই দুইটী পর্য্যায়ক্রমে করিলে সিংহমুদ্রার ফল অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়।

সিংহমুদ্রা অভ্যাস করিলে মুখবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ ও জালন্ধর বন্ধ করা সহজসাধ্য হয়। ইহার দ্বারা ঘাড়ের পেশীগুলি নমনীয় এবং তলপেটের রেক্টাস পেশীদ্বয় সবল হয়। সম্যক্‌রূপে হস্তদ্বয় দ্বারা স্ব স্ব হাঁটুর উপর চাপ দিবে, জালন্ধর বন্ধ করিলে,। মেরুদণ্ড উন্নত রাখিলে এবং বুক ফুলাইলে সিংহমুদ্রার ফল অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যায়। আবার পাছাদুটী তুলিয়া ও মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া আলগা ভাবে গোড়ালী দ্বয়ের উপর বসিলে বস্তিদেশের (pelvis)

পশীগুলির সংকোচন সহজসাধ্য হয়। ইহার ফলে মূলবন্ধ ভালরূপে করা যায়।

যে সকল শিরা দিয়া মস্তকে রক্ত প্রবাহিত হয় সেগুলি জালন্ধর বন্ধ দ্বারা আংশিক ভাগে রুদ্ধ হওয়ায় বাধিত রক্তস্রোত গলদেশে জমিয়া তত্রস্থ ফ্যারিংশ প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে সতেজ ও সবল করে। মুখ, ঘাড় ও জিহ্বার সহিত সংলগ্ন পেশীগুলিও ইহাতে পরিপুষ্ট হয়। মেরুদণ্ডের ঊর্ধাংশ চাপ-প্রাপ্ত হওয়ায় নিম্নাংশও সবল হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি, ল্যারিংশ, শ্রবণযন্ত্র, এবং লালা নিঃসারক গ্রন্থিও ইহা দ্বারা সম্যক্ ব্যায়াম প্রাপ্ত হয়। গলাধরা, গলাফোলা, টনসিল (আলজিভ্) প্রদাহ এবং বধিরতা প্রভৃতি রোগ সিংহমুদ্রা অভ্যাসে সরিয়া যায়।

যৌগিক ব্যায়ামের তিনটী তালিকা

এক

সম্পূর্ণ তালিকা

যাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল তাহাদের পক্ষে ইহা উপযোগী।

আসন

ক্রম	আসন		
১	শীর্ষাসন	... ...	১/৪ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহে আধ মিনিট বাড়াইয়া ১২ মিনিট পর্য্যন্ত।
২	সর্বাঙ্গাসন	... ...	১/২ মিনিট হইতে ছয় মিনিট পর্য্যন্ত, সপ্তাহে এক মিনিট বাড়াইয়া।
৩	মৎস্যাসন	... .	১/৪ মিনিট হইতে ৪ মিনিট পর্য্যন্ত, সপ্তাহে ১/৪ মিনিট বাড়াইয়া।
৪	হলাসন	... ...	১ মিনিট হইতে ৪ মিনিট পর্য্যন্ত সপ্তাহে ১ মিনিট বাড়াইয়া।
৫	ভুজঙ্গাসন	... ...	৩ বার হইতে ৭ বার। প্রত্যেক বারে ১০ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং দুই সপ্তাহে এক বার বাড়াইবেন।
৬	শলভাসন	... ...	৩ বার হইতে ৭ বার। প্রত্যেক বারে ১০ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং দুই সপ্তাহে এক বার বাড়াইবেন।
৭	ধনুরাসন	... ...	৩ বার হইতে ৭ বার। প্রত্যেক বারে ১০ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং দুই সপ্তাহে এক বার বাড়াইবেন।
৮	অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন	...	১/৪ মিনিট হইতে এক মিনিট প্রত্যেক দিকে। সপ্তাহে ১/৪ মিনিট বাড়াইবেন

৯	পশ্চিমোত্তান আসন ...	১/৪ মিনিট হইতে ১ মিনিট পর্য্যন্ত, সপ্তাহে ১/৪ মিনিট বাড়াইয়া।
১০	ময়ূরাসন	১/৬ মিনিট হইতে ২ মিনিট পর্য্যন্ত, সপ্তাহে ১/৪ মিনিট বাড়াইয়া।
১১	শবাসন	২ মিনিট হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত সপ্তাহে ২ মিনিট বাড়াইয়া।

বন্ধ

১২	উড্ডীয়ান বন্ধ ...	৩ হইতে ৭ বার, সপ্তাহে এক বার বাড়াইয়া।

মুদ্রা

১৩	যোগমুদ্রা	১ মিনিট হইতে ৩ মিনিট, সপ্তাহে এক মিনিট বাড়াইয়া।

ক্রিয়া

১৪	নৌলী	৩ বার হইতে ৭ বার, সপ্তাহে এক বার বাড়াইয়া।
১৫	কপালভাতি	৩ বার। প্রত্যেক বারে ১১ হইতে ১২১ বার রেচন। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক বারে ১১ বার রেচন বাড়াইয়া।

প্রাণায়াম

১৬ উজ্জায়ী ... ... ৭ হইতে ২৮ বার। প্রত্যেক সপ্তাহে ৩ বার বাড়াইয়া।

১৭ ভস্ত্রিকা ... ... ৩ বার। প্রত্যেক বারে ১১ হইতে ১২১ বার রেচন। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক বারে ১১ বার রেচন বাড়াইয়া। প্রত্যেক প্রাণায়ামের পর উপযুক্ত কুম্ভক করিবেন।

আসন সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বিধি ও নিষেধ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে বিবৃত। সুতরং কেবলমাত্র প্রাণায়ামের বিধি ও নিষেধ এখানে বলা হইল। হৃৎপিণ্ড দুর্বল থাকিলে উড্ডীয়ান, নৌলী, উজ্জায়ী এবং ভস্ত্রিকা করা অনুচিত। ফুসফুসের দৌর্বল্যে কুম্ভক-সহিত কপালভাতি, উজ্জায়ী ও ভস্ত্রিকা অভ্যাস নিষিদ্ধ; কিন্তু ফুসফুসের দুর্বলতা সত্ত্বেও উজ্জায়ীর রেচক ও পূরক করা যায়। তবে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কপালভাতি বা ভস্ত্রিকা ৮ মিনিট এবং উজ্জায়ী ৭ মিনিটের অধিক করা উচিত নহে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য এই সতেরটি ব্যায়ামই যথেষ্ট। অবশিষ্ট ব্যায়ামগুলিও সুস্থ ব্যক্তি করিতে পারেন। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, "অধিকং তু ন দোষায়" সত্য হইলেও "সর্বম্ অত্যন্তং গর্হিতম" ও সত্য। গোরক্ষাসন দিনে দুইবার করা যায়।

উড্ডীয়ান, নৌলি, কপালভাতি বা ভস্ত্রিকা এবং উজ্জায়ী উল্লিখিত পর্য্যায়ে প্রাতঃকালে অভ্যাস করিতে হয়। কপালভাতি বা ভস্ত্রিকা

ও উজ্জায়ী প্রাতে মলমুত্রত্যাগান্তে, সম্ভব হইলে স্নানান্তে, অভ্যাস করিবেন। এই তিনটী প্রাণায়াম পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে অভ্যাসই শ্রেয়ঃ; কিন্তু কপালভাতি ও ভস্ত্রিকা পদ্মাসনে অভ্যাস করা উচিত। যোগমুদ্রা, উজ্জায়ী, কপালভাতি বা ভস্ত্রিকা অপরাহ্ণেও অভ্যাস করা যায়। আর যোগাসনগুলি পূর্বাহ্ণে অভ্যাস শ্রেয়স্কর। প্রাতে বা সকালে যৌগিক ব্যায়াম করিবার সময় প্রথমে আসনগুলি ও যোগমুদ্রা, তৎপরে বন্ধ ও ক্রিয়া, এবং শেষে প্রাণায়াম করা উচিত। কপালভাতি প্রাণায়ামের অঙ্গরূপে বিবেচ্য। কোন কোন দিন দুই একটি আসন বা বন্ধ বা ক্রিয়া বা প্রাণায়াম বাদ পড়িলে কোন ক্ষতি হয় না। যৌগিক ব্যায়ামের যে সম্পূর্ণ তালিকা উপরে প্রদত্ত হইল তাহা পুরুষ ও নারী উভয় কর্তৃক সমভাবে অনুসরণীয়। নারীগণ গর্ভাবস্থায় ও ঋতুকালে যৌগিক ব্যায়াম বন্ধ রাখিবেন।

দুই

সংক্ষিপ্ত তালিকা

১	ভুজঙ্গাসন	প্রত্যেকটি ৩ হইতে ৭ বার। প্রত্যেক আসনে প্রতিবারে ২ হইতে ৫ সেকেণ্ড থাকিবেন, দুই সপ্তাহে এক বার বাড়াইয়া।
২	অর্ধশলভাসন	
৩	ধনুরাসন	

৪	হলাসন	প্রথমে অর্ধ হলাসন ২ সেকেণ্ড করিবেন। প্রত্যেক অবস্থানের পরে পূর্ণ হলাসনের চারিটি অবস্থান করিবেন ও প্রত্যেক অবস্থানে ২ সেকেণ্ড মাত্র থাকিবেন। দুই সপ্তাহে একবার বাড়াইয়া পূর্ণ হলাসন ৩ হইতে ৫ বার করা যায়।
৫	পশ্চিমোত্তান আসন ...	ইহাতে প্রতিবারে ৫ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং দুই সপ্তাহে একবার বাড়াইয়া ৩ হইতে ৭ বার করিবেন।
৬	অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন ...	ইহাতে প্রতিবারে ৫ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং দুই সপ্তাহে একবার বাড়াইয়া ৩ হইতে ৭ বার করিবেন।
৭	যোগমুদ্রা বা উড্ডীয়ান...	ইহাতে প্রতিবারে ১০ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং প্রতি সপ্তাহে একবার বাড়াইয়া ৩ হইতে ৫ বার করিবেন।

৮	বিপরীতকরণী ...	প্রথমে অর্ধ বিপরীতকরণী করিবেন। প্রত্যেক অবস্থানের পর ২ সেকেণ্ড বিশ্রাম আবশ্যক। পরে পূর্ণ আসন করিয়া ১০ সেকেণ্ড বিশ্রাম। তুই সপ্তাহে একবার বাড়াইয়া ২ হইতে ৫ বার ইহা করা যায়।
৯	উজ্জায়ী	প্রতি সপ্তাহে ৩ বার বাড়াইয়া ৭ হইতে ২১ বার করিবেন।

যাহারা সময়, সামর্থ্য বা আগ্রহের অভাবে সম্পূর্ণ তালিকা অনুসরণে অক্ষম তাহাদের জন্যই সংক্ষিপ্ত তালিকা বিহিত। যৌগিক ব্যায়ামের সকল বিধি ও নিষেধ তালিকাত্রয়ের প্রতি সমান ভাবে প্রযোজ্য। সংক্ষিপ্ত তালিকার অভ্যাস নয় বৎসর বয়সে আরম্ভ করা যায়। উজ্জায়ী ও উড্ডীয়ান বার, এমন কি তের বৎসর বয়সের পূর্বে আরম্ভ করা অনুচিত। সংক্ষিপ্ত তালিকা পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই অনুসরণীয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই তালিকা অভ্যাস করা যায়। সংক্ষিপ্ত তালিকাকে সংক্ষিপ্ততর করা যায়, আসন বা প্রাণায়ামাদির সংখ্যা কমাইয়া নহে, পরন্তু প্রত্যেকটির বার বা সময় হ্রাস করিয়া। যাহারা রুগ্ন বা জীর্ণ তাহাদের জন্যই তালিকা বিহিত।

তিন

সহজ তালিকা

	আসন	
১	উজ্জায়ী	৭ হইতে ১৪ বার, সপ্তাহে ২ বার বাড়াইয়া।
২	ভুজঙ্গাসন	প্রত্যেকটী ১ হইতে ৫ বার। প্রত্যেক আসনে প্রতিবারে ২ হইতে ৫ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং দুই সপ্তাহে এক এক বার বাড়াইবেন
৩	অর্ধ শলভাসন ...	
৪	অর্ধ হলাসন ...	এক পায়ে আরম্ভ করুন। এক পক্ষ কাল পরে দুই পায়ে করিবেন। ১৫°, ৩০°, ৬০° এবং ৯০° কোণে দুই সেকেণ্ড করিয়া বিশ্রাম। প্রতি পক্ষে একবার বাড়াইয়া ২ হইতে ৬ বার করিবেন।
৫	বক্রাসন	প্রত্যেক পাশে ৫ সেকেণ্ড করিয়া থাকিবেন এবং প্রতি পক্ষে এক বার বাড়াইয়া ৩ হইতে ৬ বার করিবেন।

৬। চক্রাসন (পার্শ্বমুখী) ...	প্রত্যেক পার্শ্বে দুই সেকেণ্ড করিয়া থাকিবেন এবং প্রতি পক্ষে একবার বাড়াইয়া ২ হইতে ৫ বার করিবেন।
৭ পশ্চিমোত্তান আসন ...	প্রত্যেক বারে তিন সেকেণ্ড থাকিবেন এবং প্রতি পক্ষে এক বার বাড়াইয়া ২ হইতে ৫ বার করিবেন।
৮ যোগমুদ্রা	প্রত্যেক বারে ৫ সেকেণ্ড থাকিবেন এবং প্রতি সপ্তাহে একবার বাড়াইয়া ৩ হইতে ৫ বার করিবেন।

যে খাদ্য ও পানীয় সহজে হজম হয় তাহাই খাওয়া উচিত। খাদ্যের পরিমাণের দিকে কড়া নজর রাখিতে হইবে। মুখে খাদ্য এমন ভাবে চর্বণ করিবেন, যাহাতে উহা উত্তম রূপে লালা-মিশ্রিত হয়। কারণ লালা-মিশ্রিত খাদ্য সহজে পরিপাক হয়। যাহাদের হজম শক্তি ক্ষীণ তাহারা দুই বেলা দুই বার পরিমিত আহার করিবেন। নৈশ আহার জলখাবারের মত লঘু হইলে আরও ভাল। আয়ুর্বেদের বাক্য "লঙ্ঘনং পরমৌষধম্" অর্থাৎ উপবাস উৎকৃষ্ট ঔষধ সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। উপবাসে অর্দ্ধেক অসুখ সারে, বাকী অর্দ্ধেক ঔষধে। মাসে দুইটী একাদশী, একটী অমাবস্যা ও একটি

পূর্ণিমা রাত্রিতে উপবাস বিধেয়। দুই বেলা উপবাস কষ্টকর এবং সাধারণতঃ অনাবশ্যক। মাসে অন্ততঃ দুইটী রাত্রি উপবাস কর্ত্তব্য।

উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ডাল, আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, ডিম বা মাংস আহার নিষিদ্ধ। আহারের আধ ঘণ্টা পরে জলপান প্রায় সকলেরই সহ্য হয়। যাহাদের হজমশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে তাহারা আহারকালেই জলপান করিতে পারেন। মদ্যাদি উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ বিষবৎ পরিত্যজ্য। চা বা কফি ছাড়িতে পারিলেই উত্তম। তামাক, সিগারেট বা বিড়ি অধিক পরিমাণে খাইলে স্নায়ুমণ্ডলী জীর্ণ হইয়া পড়ে এবং ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়। সোডা ওয়াটার, দোকানের সরবৎ প্রভৃতি অপেক্ষা বিশুদ্ধ শীতল জল শ্রেষ্ঠ পানীয়।

দিনে বা রাত্রে নিদ্রাকালে মুখ বন্ধ রাখিবেন এবং নাক দিয়া নিশ্বাস লইবেন। শ্বাসক্রিয়া নাসিকার কার্য্য, মুখের নহে। যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসের সময়েও উক্ত নিয়ম পালনীয়। দিনে বাম নাকে এবং রাত্রে ডান নাকে শ্বাস চলিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। রাত্রে বাম পাশ চাপিয়া নিদ্রা যাইবেন। অবৈধ ও অস্বাভাবিক যৌন ক্রিয়া মহাপাপ ও অস্বাস্থ্যকর। বৈধ ও স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়ার আধিক্যও বর্জনীয়। **বীর্য্যধারণ যতই করা যায় ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আহার সংযম, বীর্য্যধারণ ও যৌগিক ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাসের ফলে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।**

যৌগিক ব্যায়ামে কি কি রোগ সারে ?

কোন্ যৌগিক ব্যায়ামে কি কি রোগ সারে, তাহা প্রত্যেক ব্যায়াম বর্ণনা প্রসঙ্গে পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্বামী কুবলয়ানন্দ বলেন "কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময়, শিরঃপীড়া, অর্শ, হৃদরোগ, স্নায়ুশূল, বহুমূত্র, সন্ন্যাস রোগ, স্থূলতা, বন্ধ্যাত্ব, শুক্রাভাব ও এপেণ্ডিসাইটিস্ প্রভৃতি ব্যাধি পুরাতন অবস্থায়ও যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসে সারিয়া যায়।" শীর্ষাসনে বধিরতা, ক্ষীণদৃষ্টি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস সায়াটিকা ও ধাতুদৌর্বল্য সারে। শবাসনে উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস পায় এবং স্নায়বিক দুর্বলতা কমে। যোগমুদ্রায় কোষ্ঠকাঠিন্য ও স্বপ্নদোষাদি সারে। ময়ূরাসনে ক্ষুধামান্দ্য, অম্ল, অজীর্ণতা ও চর্মরোগাদি আরোগ্য হয়।

প্রথমে আমরা কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ ও চিকিৎসার বিস্তৃত আলোচনা করিব। কোষ্ঠকাঠিন্য বর্তমান সভ্যতার একটী বিষফল। সংক্রামক ব্যাধিতুল্য ইহা অধুনা ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদিগকে বসিয়া বসিয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয় তাহারাই সাধারণতঃ উক্ত রোগে আক্রান্ত হন। যে সকল মাড়োয়ারী দোকানদার উপবিষ্ট অবস্থায় সারাদিন থাকে তাহারা স্থূলকায় হয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য অসুখে ভোগে। যাহারা বসিয়া বসিয়া দিন কাটায় তাহারা অচিরে অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগের অধীন হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তির কোন দিন একবার মলত্যাগ হয়, কোন দিন আদৌ হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে কোন কোন দিন পাতলা মলত্যাগ হয়। স্নায়বিক ক্লান্তি হইলে বা অনিয়মিত ও অসংযত জীবন যাপন করিলে

কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। কাহারো সপ্তাহে একবার মাত্র মলত্যাগ হইলেও স্বাস্থ্য ভাল থাকে; কাহারো বা দৈনিক দুই তিন বার না হইলে দেহ সুস্থ থাকে না। ক্ষুধামান্দ্যই কোষ্ঠবদ্ধতার প্রথম লক্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়। কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া বলেন, "অল্প বা অধিক আহার, কুখাদ্য ভোজন দৈনিক বহু বার আহার, বেশী ভাত বা লঙ্কা বা মশলাদি খাওয়া, তেল ঘি বা মাখন অধিক পরিমাণে গ্রহণ, এবং হালুয়া মাংস মাছ ডিম প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য অপরিমিত ভোজন দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতার সূত্রপাত হয়। দৈনিক যত জল পান করা প্রয়োজন তার অধিক বা কম জল খাইলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। খাদ্যে খনিজ লবণ, লেবু প্রভৃতি ফল ও শব্জীর অভাব, এবং ভিটামিন প্রভৃতির অপ্রাচুর্য্য হইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। শারীরিক শ্রম না করিলে, যথাসময়ে পায়খানা না যাইলে, চা, কফি, তামাক, দোক্তা প্রভৃতি খাইলে, বা ঘন ঘন জোলাপ লইলে বা বক্রভাবে বসিলেও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে।"

কোষ্ঠবদ্ধতা সারাইতে হইলে নিয়মিত ও পরিমিত ভোজন, যথাসময়ে বিশ্রাম ও নিদ্রা এবং উপবাস সর্বপ্রথমে আবশ্যক। কাঁচা টম্যাটো ও নারিকেলের শাঁস আহারের অঙ্গীভূত করা যায়। মুখে খাদ্য উত্তমরূপে চিবাইতে হইবে। তরকারীতে মশলা যত কম হয় ততই ভাল। অধিক মিষ্টান্ন ও মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য বর্জনীয়। উষাপান ও ভাতের সহিত পাতি বা কাগ্‌জি লেবুর রস গ্রহণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। মলমূত্রের বেগ আসিলে অবিলম্বে উহা ত্যাগ করা উচিত। খাদ্যের সহিত সর্ব প্রকার ভিটামিন কিছু কিছু খাইলে পরিপাক ও কোষ্ঠ পরিষ্কার সহজে হয়। মাখন ও টাট্‌কা শাক

শব্জীতে ভিটামিন 'এ' বেশী থাকে। চোকরযুক্ত আটা, কলাই শুঁটী প্রভৃতিতে ভিটামিন 'বি'; পেঁয়াজ, টম্যাটো, অঙ্কুরিত মুগ, দুধ, ঘোল এবং টাট্কা ফলে ভিটামিন 'সি'. এবং শুষ্কনারিকেলে ভিটামিন 'ডি' বেশী থাকে। সৌর বর্ণালীর (solar spectrum) অতি-বেগুনী রশ্মি (ultra-violet rays) ভাইটামিন 'ডি'র অনন্ত উৎস। সকালে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট সূর্যালোকে স্নান করিলে ভাইটামিন 'ডি' প্রচুর পরিমাণে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। বাদাম তেল, জলপাই তেল, নারিকেল তেল প্রভৃতিতে ভাইটামিন 'ই' বেশী থাকে। উপরোক্ত দ্রব্যসমূহের কিছু কিছু দৈনিক খাদ্যের অঙ্গীভূত করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়।

প্রত্যহ প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করিবেন। তলপেটের ব্যায়াম বিশেষ আবশ্যক। উড্ডীয়ান ও নৌলী এবং শীর্ষাসন কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে সম্যক্ সমর্থ। নিশ্বাস ব্যায়াম যোগাসনের সহিত সংযুক্ত হইলে আশু ও অমোঘ ফলপ্রদ হয়। অপান বায়ুর ক্রিয়া উত্তমরূপে না হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। প্রাতে ২।১টি যোগাসন নিশ্বাস ব্যায়ামের সহিত অভ্যাস করিলে অপান বায়ুর ক্রিয়া অচিরে সরল হয় এবং মলমূত্রের বেগ আসে।

কিরূপে এপেণ্ডিসাইটিস যৌগিক ব্যায়ামে আরোগ্য হইতে পারে এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব। এপেণ্ডিক্স (appendix) কিকামের বহির্দেশে সংযুক্ত এবং উহার অনাবশ্যকীয় অংশ বলিলেও চলে। ইহা আকারে একটি কীটের মত বলিয়া উহার নাহ vermi from. ইহা দৈর্ঘ্যে ২ হইতে ২০ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থে ৯ সেন্টিমিটার হয়। ইহার প্রদাহকে এপেণ্ডিসাইটিস বলে। এপেণ্ডিক্স

হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা মলভাণ্ডে প্রবেশ করে ও উহাকে সিক্ত রাখে। কোষ্ঠবদ্ধতাই এপেণ্ডিক্সের একটি প্রধান কারণ। বহু দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে এপেণ্ডিক্সের প্রদাহ হয়। মলভাণ্ড মলপূর্ণ হইলে উহার স্ফীতির চাপে এপেণ্ডিক্সে কিছু দূষিত পদার্থ প্রবেশ করে; কিন্তু উহা বাহিরে আসিতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায়, উক্ত পদার্থ দীর্ঘ কাল এপেণ্ডিক্সে থাকিলে এপেণ্ডিক্স পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। কখন কখন আহার্য্যের সঙ্গে কঠিন বস্তুকণা গলাধঃকৃত হয়। সেইগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়া কিকামে যায় এবং তৎপরে এপেণ্ডিক্সে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত আগন্তুক পদার্থ দ্বারা এপেণ্ডিক্সে যে প্রদাহ হয় তাহাকে এপেণ্ডিসাইটিস বলে।

অত্যধিক দৌড়াইলে বা হাঁটিলে বা সাইকেল চড়িলেও এপেণ্ডিক্সের প্রদাহ জন্মে। ইউরোপের হেগ্ হাসপাতালের সার্জন ডাঃ অফারহ্যান্স (Offerhans) বলেন, "সাধারণ লোকদের মধ্যে শতকরা ৬২ জনের এপেণ্ডিক্স সোয়াস (psoas) পেশীগুলির এত সন্নিকটবর্তী যে, উহা উক্ত পেশীগুলির উপরে অবস্থিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দৈনিক জীবনে বহু বার সোয়াস পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া এপেণ্ডিক্সের উপর চাপ দেয়। এইরূপ ক্রমাগত চাপদানের ফলে এপেণ্ডিক্স প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহার ক্ষুদ্র দ্বার রুদ্ধ হয়।" এলোপ্যাথিমতে অস্ত্রোপচারই ইহার প্রধান চিকিৎসা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়। যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক এপেণ্ডিসাইটিস সারিয়া যায়। উড্ডীয়ান ও নৌলী এপেণ্ডিসাইটিস দূরীকরণে ও নিবারণে সমর্থ।

যৌগিক ধৌত ক্রিয়ার দ্বারাও আশু উপকার পাওয়া যায়। শীর্ষাসন ও সর্বাঙ্গাসনে এপেণ্ডিসাইটিস আরোগ্য হইতে পারে।

স্বামী কুবলয়ানন্দের নির্দ্দেশে জনৈক যুবক যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসের দ্বারা এপেণ্ডিসাইটিস হইতে চিরমুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত যুবক ১৯২৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে এক প্রাতে তলপেটের ডান দিকে ছুঁচ ফোটার মত যন্ত্রণা পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন। সপ্তাহখানেক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিবার পরও যখন উহা কমিল না তখন তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লইলেন। উক্ত ডাক্তার যুবকটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার পুরাতন এপেণ্ডিসাইটিস হইয়াছে। তন্নির্দ্দেশে যুবকটি অস্ত্রোপচার করিতে সম্মত না হইয়া স্বামী কুবলয়ানন্দের নিকট আসেন। স্বামী কুবলয়ানন্দ তাহাকে যে সকল যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস ও পথ্য সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন তাহা মাত্র দুই সপ্তাহ করিবার পর যুবকটি বেশ উপকার বুঝিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি তাহার আরোগ্য সংবাদ যে পত্রে স্বামী কুবলয়ানন্দকে দিয়াছিলেন তাহা যোগ মীমাংসা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রক্তচাপ বাড়িলে বা কমিলে যোগাসন ও প্রাণায়াম করা যায় কিনা—এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব। এই বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে ব্যায়াম বিজ্ঞানের মূলসূত্র সম্যক্ অবগত হওয়া আবশ্যক। ব্যায়াম তত্ত্বের বিশ্লেষণে সাধারণ ব্যায়াম ও যৌগিক ব্যায়ামের মধ্যে আসল পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রত্যেক শ্রমসাধ্য ব্যায়ামেই কিঞ্চিৎ রক্তচাপ বাড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যায়ামে কয়েকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয় এবং

উহাদের পেশীগুলির পুনঃ পুনঃ সংকোচন ও সম্প্রসারণ নিমিত্ত দেহের কিছু ক্ষয় হয়। উক্ত ক্ষয়জনিত যে সকল অসার পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি বিষাক্ত। সুতরাং দেহযন্ত্র তখন এই বিষাক্ত পদার্থসমূহ অপসারণে ব্যস্ত হইয়া উঠে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে কার্বণ ডাই অক্সাইড অন্যতম। সাধারণ রক্তপ্রবাহে এইরূপ স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ায় উল্লিখিত বিষাক্ত পদার্থ বহিষ্করণ সম্ভব না হওয়ায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস অধিকতর বেগে ও জোরে ক্রিয়াশীল হয়। এইজন্যই ব্যায়াম কালে শ্বাসগতি দ্রুততর বেগে ও জোরে চলে। অসার পদার্থ অপসারণে অসমর্থ হইলে দৈহিক ক্লান্তি আসে। তখন বিশ্রাম আবশ্যক। ইহাই দৈহিক ক্লান্তির বৈজ্ঞানিক কারণ।

দ্রুততর রক্তপ্রবাহের ফলে হৃৎপিণ্ড কিঞ্চিৎ স্ফীত (elongated) হয় এবং রক্তচাপ বাড়ে। যতই ব্যায়াম শ্রমসাধ্য হইবে রক্তচাপ ততই বাড়িবে। দশ মিনিট ব্যাপী একশত গজ দৌড়ে রক্তচাপ ২০০ মিলিমিটার (Mm Hg) পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি উক্ত দৌড় বিশ মিনিট বা ততোধিক সময় ধরিয়া চলে তাহা হইলে রক্তচাপের বৃদ্ধি অত্যল্প মাত্র হয়। প্রথম প্রকার ব্যায়ামকে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম (Exercise effort) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে সহনশীল ব্যায়াম (exercise of endurance) বলা হয়। শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে রক্তচাপ বৃদ্ধির হার নির্ধারণের চেষ্টা পাশ্চাত্যে প্রভূত পরিমাণে করা হইয়াছে। কোন স্থানে এগারজন স্বাস্থ্যবান যুবককে ভার উত্তোলন করিতে দেওয়া হয়। তাহাদের রক্তচাপ বৃদ্ধির তালিকা ১৯০১ খ্রীঃ মার্চ মাসে আমেরিকান জার্ণাল অব ফিজিওলজিতে (American Journal of Physiology)

প্রকাশিত হয়। মেকেঞ্জি কৃত Exercise in Education and Medicine নামক ইংরাজি পুস্তকে এই তালিকা পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত এগার জন যুবকের মধ্যে একজনের বয়স ৩১ বৎসর এবং ওজন ১১৭॥০ পাউণ্ড ছিল। যুবকটী ৪৮৬ পাউণ্ড ভার তুলিয়াছিল। ভারোত্তোলনের পূর্বে ও মধ্যে এবং দুই তিন মিনিট পরে রক্তচাপ যথাক্রমে ১০৯ এবং ১১৩ মিলিমিটার হয় ও রক্ত-চাপ বৃদ্ধির শতকরা হার ৯২.৭ হয়। স্বামী কুবলয়ানন্দ বোম্বাইতে এগারটি যুবককে সর্বাঙ্গাসনে, মৎস্যাসনে ও শীর্ষাসনে অবস্থিত রাখিয়া উহাদের রক্তচাপ বৃদ্ধির হার নিরূপণ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার বিস্তৃত তালিকা 'যোগ মীমাংসা' পত্রিকায় প্রকাশিত। উক্ত তালিকা হইতে জানা যায়, যৌগিক ব্যায়ামে রক্তচাপ বৃদ্ধি অত্যন্ত মাত্রায় হয়। এই হেতু যৌগিক ব্যায়ামকে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম না বলিয়া মৃদু সহনশীল ব্যায়াম বলা উচিত।

সাধারণ ব্যায়ামের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অঙ্গসঞ্চালন যৌগিক ব্যায়ামে না থাকায় শক্তির ব্যয় উহাতে খুব সামান্যই হয়। যে কোন যৌগিক ব্যায়ামে নির্দ্দিষ্ট সময় অবস্থান করিতে হয়, কোন অঙ্গ সঞ্চালন আবশ্যক হয় না। শবাসনে পৈশিক সঙ্কোচন একবারে অনাবশ্যক। ইহা দ্বারাই সাধারণ ব্যায়াম ও যৌগিক ব্যায়ামের মধ্যে মূল পার্থক্য লক্ষিত হয়। কুস্তি, দৌড়, দাঁড় টানা ও সাইকেল চড়া প্রভৃতি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম। এইজন্য এগুলিকে মল্লবিদ্যা (gymnastics) বলা যাইতে পারে। মল্লবিদ্যায় দেহগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষণ সন্তোষজনক ভাবে হয় না। জার্মাণীতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে উক্ত বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়।

যুদ্ধমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর মিলিত প্রচেষ্টায় সে সময় বার্লিন সহরে রয়াল সেন্ট্রাল জিমনাষ্টিক ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার, বিখ্যাত ব্যায়ামবিৎ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত দ্বারা উক্ত ব্যায়ামাগার হইতে প্যারালাল বার ও হরাইজণ্টাল বার তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের মতে বার ব্যায়ামে দেহের অত্যধিক পরিশ্রম হওয়ায় দেহগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষণ ব্যাহত হয়। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত সূর্য্য-নমস্কারকে শ্রমসাধ্য ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সূর্য্যোপাসনার অঙ্গীভূত বলিয়া উক্ত ব্যায়াম প্রণালী মহারাষ্ট্রে কয়েক শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর নরনারীগণ ব্যাপকভাবে উক্ত ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত ব্যায়াম মহারাষ্ট্রে এত ব্যাপক হইয়া পড়ে যে, বহু যুবক প্রত্যহ প্রভাতে বার শত নমস্কার ব্যায়াম করিতেন। এই সকল যুবকের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ, রাজা ও রাজপুত্র ছিলেন। ১৯২৬ সালে নাসিকে যে নিখিল মহারাষ্ট্র ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে কোন কোন প্রতিযোগী ২০০০ বার নমস্কার ব্যায়াম করিয়াছিলেন; কিন্তু নমস্কার ব্যায়ামেও দেহগঠন বা স্বাস্থ্যরক্ষণ আশানুরূপ হয় না। যৌগিক ব্যায়াম নমস্কার ব্যায়াম অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট।

দীর্ঘকাল ব্যায়াম-বিজ্ঞান গবেষণার ফলে অধিকাংশ পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিৎগণের মধ্যে এই পাঁচটী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।—(১) নিশ্বাস ব্যায়ামের আবশ্যকতা দিন দিন তাহারা অধিক পরিমাণে বুঝিতেছেন। (২) দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুমণ্ডলীকে তাহারা সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দিতেছেন। (৩) দৈহিক ব্যায়ামের তালিকায়

মেরুদণ্ডের ব্যায়ামকে তাহারা অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন। (৪) পৈশিক পুষ্টির দিকে তাহাদের দৃষ্টি কমিয়া স্নায়ুপুষ্টির দিকে দৃষ্টি বাড়িতেছে। (৫) নালীহীন গ্রন্থিসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ নূতন নূতন ব্যায়াম তাহাদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইতেছে। এই পাঁচটি বিষয়ে যৌগিক ব্যায়াম যে কতদূর সমুন্নত ও সতর্কিত তাহা পাঠক-পাঠিকা এই পুস্তক পাঠে বিশদ ভাবে অবগত হইবেন।

এখন আমরা পূর্ব্বারব্ধ আলোচনা উপসংহার করিব। যৌগিক ব্যায়ামে পৈশিক শক্তির ব্যয় সামান্যমাত্র হওয়ায় নির্ভয়ে সকলে ইহা করিতে পারেন। সর্বাঙ্গাসনে ঘাড় ও তলপেটের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু হস্তদ্বয় খুঁটীর মত দেহভার ধরিয়া রাখায় পেশীশক্তির অপচয় আদৌ হয় না বলিলেই চলে। শীর্ষাসনেও পেশীশক্তির অপব্যয় হয় না। ইহার কারণ, মাথার উপর দাঁড়াইলে মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা দেহস্থ রক্ত মস্তিষ্ক অভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই জন্য শীর্ষাসনে রক্তচাপ বাড়ে না। বেলুড় মঠের কোন বয়স্ক সন্ন্যাসীর রক্ত চাপ কমিয়া যায়। বহু চিকিৎসা এবং দীর্ঘ বায়ু পরিবর্তনেও তাঁহার রক্তচাপ পূর্বাপেক্ষা বাড়ে নাই। জনৈক চিকিৎসক একমাস শীর্ষাসন করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেন। উক্ত যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসের দ্বারা কিছু দিন পরে তাঁহার রক্ত-চাপ স্বাভাবিক হয়।

স্বামী কুবলয়ানন্দ শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন ও মৎস্যাসনে রক্তচাপ বৃদ্ধির যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসকালে রক্তচাপের যে সামান্য বৃদ্ধি হয় তাহা দুই তিন মিনিট পরে কমে এবং তদন্তে রক্তচাপ স্বাভারিক অবস্থায় প্রত্যাগত হয়। যৌগিক ব্যায়ামের মধ্যে একমাত্র শীর্ষাসনে রক্তচাপ বৃদ্ধি

অধিক হয়। উক্ত আধিক্যের পরিমাণ ১৫ মিলিমিটার মাত্র। এই বৃদ্ধি দ্বিতীয় মিনিটের শেষে হয় এবং তৎপরে আবার কমিয়া যায়। হস্তদ্বয় ভূমিতে প্রসারিত রাখিয়া যে সর্বাঙ্গাসন করিতে হয় তাহাতে তৃতীয় মিনিটের শেষে রক্তচাপ অধিক হয় এবং তৎপরে আবার কমিতে আরম্ভ করে। মৎস্যাসনে রক্ত চাপ একটু বাড়িয়াই আবার কমিতে থাকে। স্বামী কুবলয়ানন্দ পাঁচ মিনিট কাল এই সকল যোগাসনে অবস্থিত ব্যক্তিগণের উপর উক্ত পরিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাব পরীক্ষাসমূহের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যৌগিক ব্যায়াম যত অধিক সময় করা হয় রক্তচাপ ততই স্বাভাবিক হইয়া যায়। অবশ্য, ব্যায়ামের স্থিতিকাল নিয়মিতভাবে দৈনিক অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়াইতে হইবে। সাধারণ ব্যায়ামের ন্যায় যৌগিক ব্যায়ামের ঠিক পরেই রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার নীচে নামিয়া যায়। এই বিষয়েও যৌগিক ব্যায়াম অন্যান্য ব্যায়াম অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও উপকারী। কারণ যৌগিক ব্যায়ামের পরে রক্ত-চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নীচে যে টুকু নামে তাহা সামান্য মাত্র। ইহা আশ্চর্য্য যে, শীর্ষাসনে উক্ত হ্রাস আদৌ লক্ষিত হয় না।

যখন হৃৎপিণ্ড সবল এবং রক্তবাহী যন্ত্র স্বাস্থ্যবান্ ও নমনীয় থাকে তখন স্বাভাবিক রক্তচাপ দ্বিগুণ বাড়িলেও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সুতারাং কতগুলি যোগাসন রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হ্রাসে অভ্যাস করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রক্তচাপ বাড়িলে বা কমিলে এবং হৃৎপিণ্ড একটু দুর্বল হইলে ডাক্তারগণ সাধারণতঃ রোগীদিগকে পূর্ণ বিশ্রাম লইতে পরামর্শ দেন। বিশ্রাম চিকিৎসা

(rest-cure) এবং উপবাস দ্বারা দেহের ওজন কমান—এই দুইটি রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রধান চিকিৎসারূপে অধুনা পরিগণিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উক্ত চিকিৎসাতেও কোন উপকার পাওয়া যায় না। যোগাসন ও প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এবং রক্তচাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস সমস্তই ধীরে ধীরে সারিয়া যায়। তবে কোন্ রোগে কি কি যৌগিক ব্যায়াম করা আবশ্যক তাহা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারিত হইলেই ভাল।

কোন্ কোন্ যৌগিক ব্যায়ামে দৈহিক উচ্চতা বাড়িতে পারে? এই প্রশ্ন আমার পুস্তকের বহু পাঠক ও পাঠিকা আমাকে সাক্ষাতে বা চিঠিতে জানাইয়াছেন। স্বামী কুবলয়ানন্দ এই বিষয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত 'যোগমীমাংসা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। দৈহিক দীর্ঘতা বৃদ্ধি করিতে হইলে অস্থির দৈর্ঘ্য বাড়ান আবশ্যক। অস্থিসমূহও তন্তুগুলির ন্যায় নির্মিত। মানবের উচ্চতা নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ এবং মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করে। আমরা জানি, মেরুদণ্ড শৈশবে ৩২টি অস্থির দ্বারা নির্মিত থাকে। এই সকল অস্থি এবং কঙ্কালের বৃদ্ধির দ্বারা দেহের উচ্চতা বাড়ে। মেয়ার সাহেবের মতে চাপ (pressure) এবং টান (tension) দ্বারা নরকঙ্কাল বাড়ে। মেরুদণ্ড সম্বন্ধেও উক্ত বিধি প্রযোজ্য। জাগের (Jager) তাঁহার 'Problems of Nature' (প্রকৃতির সমস্যা সমূহ) গ্রন্থে বলেন, "প্রত্যেক মেরু-অস্থির (vertibræ) দৈর্ঘ্য শৈশবে ও যৌবনে নিম্ন মুখে বাড়ে। উক্ত বৃদ্ধির অন্যতম কারণ দেহ-ভারের চাপ।"

শীর্ষাসনে উক্ত চাপ যথাসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উড্ডীয়ান ও নৌলী দৈহিক দীর্ঘতা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক। পশ্চিমোত্তান আসন,

ভুজঙ্গাসন ও হলাসন উক্ত কার্য্যসাধনে সমভাবে সমর্থ। মানবদেহে প্রায় দুই শত খণ্ড অস্থি আছে। সেইগুলি যৌবনে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে। সুতরাং যৌবনে এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করিলে সমধিক অস্থিবৃদ্ধি সম্ভব হয়। শারীর তত্ত্বের মতে মেরুদণ্ড বা কঙ্কালের বৃদ্ধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত চলে। সুতরাং পনের হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে যে কোন নরনারী যৌগিক ব্যায়াম অর্থাৎ যোগাসন ও প্রাণায়াম নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিলে তাহাদের দেহের উচ্চতা নিশ্চয়ই বাড়িবে। রিং ব্যায়াম (ring exercise) অপেক্ষা যৌগিক ব্যায়ামে এই বিষয়ে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি সকল পুরাতন ব্যাধিতে যৌগিক ব্যায়াম অশেষ ফলপ্রদ। যোগাসনের সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে রোগরাহিত্য, পূর্ণস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন নিশ্চয়ই লাভ হইবে।

আমাদের পূর্বপুরুষ আর্য্যগণ যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস দ্বারা রোগমুক্ত, স্বাস্থ্যমণ্ডিত ও শতায়ু হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনা যজুর্বেদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

পশ্যেম: শরদঃ শতং, জীবেম: শরদঃ শতম্।
শৃণুয়াম: শরদ: শতং, প্রব্রবাম: শরদ: শতং ॥
অদীনাঃ স্যাম: শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরপ্রাসাদে আমরা যেন শত বৎসর দেখিতে পাই, শত বৎসর বাঁচিতে পারি, শত বৎসর শুনিতে পাই, শত বৎসর কথা বলিতে পারি, শত বৎসর দৈন্যমুক্ত থাকি এবং শতাধিক বর্ষ এই সকল সম্পদে ভূষিত হই।

যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া বাংলার নরনারী, বালকবালিকা, যুবকযুবতী, ও ছাত্রছাত্রীগণ রোগহীন, স্বাস্থ্যবান ও শতায়ু হউন। ঈশ্বর-চরণে ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। হরি ওঁ তৎ তৎ।

পরিশিষ্ট

এক

যৌগিক ব্যায়ামের বৈশিষ্ট্য*

সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং জাতীয়তার পুষ্টি সাধনের জন্য যেমন বিদেশী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দ্রব্যাদি বর্জন এবং স্বদেশী শিক্ষা, মাতৃভাষাদির প্রচলন আবশ্যক, তেমনি বিদেশী ব্যায়াম ও ক্রীড়াদির পরিবর্তে স্বদেশী ব্যায়ামাদির প্রবর্তন অবশ্য কর্তব্য। সুদীর্ঘ পরাধীন অবস্থায় আমাদের দেশে বিদেশী ব্যায়ামাদি প্রচলিত হওয়ায় স্বদেশী ব্যায়ামাদি লুপ্তপ্রায়। যে দেশে যাহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, সে দেশের প্রাণিদেহের পক্ষে তাহা অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। শীতপ্রধান ইংলণ্ডের ব্যায়ামাদি গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের উপযোগী নয়। ওদেশের খাদ্য-পোষাকাদির ন্যায় ব্যায়ামাদিও ভারতীয় দেহের অনিষ্টকর। সেই জন্য যৌগিক ব্যায়াম, সন্তরণ, লাঠিখেলা ও ছোরা খেলা, কুস্তি, হাডু-ডু প্রভৃতি স্বদেশী ব্যায়াম স্কুলে স্কুলে প্রচলন করা উচিত।

যৌগিক ব্যায়ামই ভারতীয় ব্যায়ামসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। আমাদের মুণি ঋষিগণ এই দেশের জলবায়ুর উপযোগী এই ব্যায়াম-বিজ্ঞান আমাদের জন্য উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। হঠযোগ শাস্ত্রে যে আসনাদির বর্ণনা আছে সেইগুলিই বিজ্ঞানের আলোকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে যৌগিক ব্যায়াম নামে বর্তমান শতকে প্রচলিত। বোম্বাইয়ের স্বামী কুবলয়ানন্দ এই ব্যায়াম পদ্ধতির আধুনিক প্রবর্তক। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। স্বীয় গুরু যোগিরাজ মাধবদাশের আদেশে তিনি এই যুগান্তকারী মহৎ কার্য্যে ব্রতী হন। উক্ত ব্যায়াম পদ্ধতি বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি

---

*ইহা ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুন শুক্রবারে বালী শান্তিরাম বিদ্যালয়ে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি কর্তৃক পরিচালিত শরীর-চর্চা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ-শিবিরে প্রদত্ত ভাষণ এবং ১৩৫৫ সালে আষাঢ় মাসে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রদেশের যুবক ও ছাত্র সমাজের সুপ্রিয় হইয়াছে। এই বিষয়ে ইংরেজীতে অনেক গ্রন্থ আছে। মৎ প্রণীত 'যৌগিক ব্যায়াম' পুস্তকে সাতাশটি ব্যায়ামের বিবরণ ও চিত্র আছে। বাংলা ভাষায় যৌগিক ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক। ইহাতে শারীর তত্ত্বের আলোকে ব্যায়ামগুলি ব্যাখ্যাত। স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কারাবাস কালে নিয়মিতভাবে কয়েকটি যৌগিক ব্যায়াম করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদূর আমেরিকাতেও উক্ত ব্যায়াম ছাত্রমহলে আদৃত হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভারতে আসিয়া স্বামী কুবলয়ানন্দের নিকট যৌগিক ব্যায়াম উত্তমরূপে শিক্ষান্তে স্বদেশে উহা প্রচার করিতেছেন।

স্বামী কুবলয়ানন্দের গুরুদেব মাধবদাস ছিলেন একজন বাঙালী যোগী। তিনি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের সমীপবর্তী এক গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং বিশ বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন এবং ২৩ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। যোগসাধনায় তীব্র আগ্রহ হৃদয়ে জাগ্রত থাকায় যোগী গুরুর সন্ধানে তিনি সমস্ত ভারতীয় তীর্থ পর্য্যটন করেন। তীর্থ ভ্রমণ-কালে তিনি সিদ্ধ যোগিগণের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে বিশ বৎসরাধিক যোগাভ্যাসে নিমগ্ন হন। যোগসাধনার ফলে তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়াছিল। দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি হস্তস্পর্শে সারাইতে পারিতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গুজরাটে নর্মদা তীরে আশ্রম স্থানপূর্বক সকলকে যোগশিক্ষা দিতেন। তাঁহার উপদেশে যোগাসন অভ্যাস করিয়া বহু রোগী দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বামী কুবলয়ানন্দ-প্রমুখ তৎশিষ্যগণ যৌগিক ব্যায়াম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মহাযোগী মাধবদাস ১২৩ বৎসর বয়সে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় আশ্রমে দেহ ত্যাগ করেন।

মাংসপেশীর পুষ্টি সাধন অন্যান্য ব্যায়াম বিজ্ঞানের আদর্শ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাংসপেশী বর্দ্ধিত হইলেই দেহের স্বাস্থ্য বা রোগরাহিত্য সর্বাংশে লাভ

হয় না। তজ্জন্য বড় বড় কুস্তিগীর বা পালোয়ানগণও হৃদ্‌রোগে বা রক্ত চাপের বৃদ্ধিতে আক্রান্ত হন। কিন্তু যৌগিক ব্যায়ামের মূল উদ্দেশ্য স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টি সাধন। স্নায়ুমণ্ডলী মাংসপেশীসমূহকে চালিত করে। হাতের বা পায়ের একটি স্নায়ু নিষ্ক্রিয় হইলেই উক্ত অঙ্গ অচল হয়। যৌগিক ব্যায়ামের ন্যায় অন্য কোন ব্যায়াম স্নায়ু মণ্ডলীকে এত পুষ্ট করিতে পারে না। স্নায়ুজাল সবল ও পুষ্ট থাকিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। মস্তিষ্কই স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্ককে সুস্থ ও পুষ্ট করিবার সহজ উপায় কোনও ব্যায়াম পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট হয় নাই। কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামের দ্বারা অনেক সময় মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু যৌগিক ব্যায়ামে শীর্ষাসন মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তপ্রবাহ আনিয়া উক্ত কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কারাগারে বাসকালে এই ব্যায়ামটী প্রত্যহ অভ্যাস করিতেন। দীর্ঘ কাল অভ্যাসের ফলে তিনি শীর্ষাসনে প্রায় আধঘণ্টা থাকিতে পারিতেন। ইহার অদ্ভুত উপকারিতা তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার সি. জে. মুটার্ট 'নিউইয়র্ক টাইমস্' নামক বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে এই ব্যায়ামের সুফল স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। একবার ফিলাডেলফিয়া মেডিকেল কলেজে বহু ডাক্তারের সভায় এই ব্যায়ামটি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, শীর্ষাসন কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণতা রোগের মহৌষধ। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার অসংখ্য রোগী এই ব্যায়ামের দ্বারা উক্ত দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বয় হইতে চিরমুক্ত হইয়াছেন।

গ্রীন সাহেব তাঁহার 'রোগতত্ত্ব' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ অপ্রচুর হইলেই স্নায়বিক পীড়া উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অপ্রাচুর্য্য নিবন্ধন অবসাদ, দীর্ঘ সূত্রিতা, অনুৎসাহ প্রভৃতি মানসিক বিকার জন্মে। উন্মনাভাব, বিষন্নতাদি স্নায়ুরোগ একই কারণে উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্কের নীচে অবস্থিত বলিয়া, মাধ্যাকর্ষণ ঠেলিয়া মস্তিষ্কে রক্তস্রোত পাঠাইতে হৃৎপিণ্ডের অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু শীর্ষাসনে মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডের নিম্নে স্থাপিত হওয়ায়, রক্ত অনায়াসে মস্তিষ্ককে বিধৌত করে। মস্তিষ্কও কিয়ৎক্ষণের জন্য

মাধ্যাকর্ষণমুক্ত হওয়ায় অপূর্ব বিশ্রাম লাভ করে। ইহাতে মলভাণ্ড বিপরীতমুখী হওয়ায় পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতাও দূর হয়। মস্তিষ্কের রক্ত-স্নান দ্বারা চক্ষু ও কর্ণের অসুখ সারিয়া যায় এবং জিহ্বার লালা-নিঃসরণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিপাক শক্তি বাড়ে। মূঢ়তা, জড়তা, স্মৃতি-শক্তির হ্রাস প্রভৃতি অসুখও নিঃশেষে আরোগ্য হয়।

মাংসগ্রন্থির পুষ্টিসাধনে এবং জীবনী-শক্তি বর্ধনে যৌগিক ব্যায়াম অদ্বিতীয়। গলদেশে যে থাইরয়েড মাংসগ্রন্থি আছে, উহা শরীরস্থ অন্যান্য মাংসগ্রন্থির প্রভু। থাইরয়েড মাংসগ্রন্থি নিস্তেজ ও দুর্বল হইলে শরীর স্বাস্থ্যহীন ও ব্যাধিমন্দির হয়। গ্রীন সাহেব তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "থাইরয়েড হইতে রসনিঃসরণের ব্যাঘাত হইলে অজীর্ণতা, চর্মরোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা, শারীরিক ওজনের হ্রাস ও চর্বির অল্পতা প্রভৃতি রোগ জন্মে।" পশু শরীর হইতে উক্ত গ্ল্যাণ্ডগুলি তুলিয়া ফেলার পর দেখা গিয়াছে, তাহাদের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও দৌর্বল্য সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, থাইরয়েড নিষ্ক্রিয় হইলেই শরীর জরাগ্রস্ত হয়। এই জন্য ইংলণ্ডের মুলার এবং আমেরিকার ম্যাকফেডেন নামক বিখ্যাত ব্যায়াম-বীরদ্বয় থাইরয়েডকে সতেজ ও সরল রাখিবার জন্য বহু ব্যায়াম উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উদ্ভাবিত ব্যায়াম অপেক্ষা সর্বাঙ্গাসন নামক যৌগিক ব্যায়াম সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, অধিক ফলপ্রদ ও বৈজ্ঞানিক। অষ্ট্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার ভার্ণক মনুষ্য-দেহ হইতে নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ থাইরয়েড গ্রন্থি অস্ত্র সাহায্যে তুলিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্তে বানরের গলার মাংসগ্রন্থি (monkey gland) বসাইয়া অনেককে পুনর্যৌবন প্রদান করিয়াছেন। ভারতের কোন কোন ধনী অজস্র অর্থব্যয়ে স্বীয় থাইরয়েডের স্থলে বানরের মাংসগ্রন্থি ডাক্তার ভার্ণকের দ্বারা বসাইয়া দীর্ঘ জীবন ও যৌবন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কার্য্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও বিপদ-জনক। পশুর মাংসগ্রন্থি মানবদেহে পাশবিক প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করে। কিন্তু সর্বাঙ্গাসনের এমন অদ্ভুত শক্তি আছে যে, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে দুর্বল থাইরয়েড সবল, সতেজ ও সক্রিয় হয়। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের ফলে কুষ্ঠ

রোগীও রোগমুক্ত হইয়াছে। ইহা স্বামী কুবলয়ানন্দ স্বীয় 'যোগ মীমাংসা জার্নালে' প্রকাশ করিয়াছেন। স্বপ্নদোষ, শুক্রহীনতা, শীর্ণতা প্রভৃতি রোগও এই ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে আরোগ্য হয়।

দেহের সর্বাঙ্গীন ব্যায়াম যোগাসনের দ্বারাই সম্যক্ সম্ভব। দেহের ও মনের শক্তিক্ষয় নিবারণে যৌগিক ব্যায়াম সর্বাপেক্ষা পটু। কিন্তু অন্যান্য ব্যায়াম পদ্ধতি উগ্র বলিয়া শক্তিক্ষয় বৃদ্ধি করে। এজন্য যাহারা মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহাদের পক্ষে যৌগিক ব্যায়ামই প্রশস্ত। ফুটবল, কুস্তি প্রভৃতি উদগ্র ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক; নচেৎ স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা সমধিক। আধ ঘণ্টার ব্যবধানে যৌগিক ব্যায়ামের সহিত অন্যান্য ব্যায়ামও করা চলে। যৌগিক ব্যায়াম ব্যতীত অন্য কোন ব্যায়ামে নিঃশ্বাসের ব্যায়াম হয় না। খাদ্য, পানীয় ও বায়ুই মানবের প্রধান আহার। এই আহারত্রয়ের মধ্যে বায়ুর প্রয়োজনই শরীরে সর্বাপেক্ষা অধিক। খাদ্য ও পানীয় ব্যতীত কয়েক ঘণ্টা জীবন-ধারণ সম্ভব, কিন্তু বায়ু ব্যতীত মানুষ কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারে না। বায়ুই দেহের প্রাণ। বায়ু দ্বারাই রক্ত সঞ্চালন, মলমুত্র ত্যাগ, অন্ন গলাধঃকরণ ও পরিপাক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। অক্সিজেন যতই গ্রহণ করা যায় ততই শরীর সুস্থ থাকে। বায়ুমণ্ডলের এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। সমুদ্র এবং নদীর জলে $\frac{8}{9}$ অংশ অক্সিজেন। উদ্ভিদ্‌জগৎ ও পর্বতাদির অর্দ্ধেকের অধিকাংশ অক্সিজেনে পরিপূর্ণ। আমাদের শরীরে যত রক্ত আছে, তাহা তিন মিনিটের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। ফুসফুসে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিলে অক্সিজেন রক্তে মিশ্রিত হইয়া উহাকে গাঢ় ও পুষ্ট করে। এই জন্য ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়ামের ন্যায় আবশ্যক। পরন্তু আমরা যে নিঃশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করি তাহা এত অনিয়মিত যে, তাহাতে ফুস্‌ফুসের পূর্ণ ক্রিয়া হয় না। সাধারণ নিঃশ্বাসে ফুসফুসের মাত্র এক ষষ্ঠাংশ ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট পঞ্চ ষষ্ঠাংশ অব্যবহৃত থাকে। এই অব্যবহৃত অংশে বীজাণু জমিয়া বা জাত হইয়া যক্ষা, হাঁপানি প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই কারণে ফুস্‌ফুসের নিত্য ব্যায়াম

একান্ত কর্তব্য। ফুস্‌ফুসের অব্যবহৃত অংশ ব্যায়ামের দ্বারা কার্য্যকরী থাকিলে, অসাধারণ সামর্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। এইজন্য যৌগিক ব্যায়ামে ফুস্‌ফুসের ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যায়াম অভ্যাস করিলে সর্দি, হাঁপানি, কাশি প্রভৃতি কঠিন ব্যাধিও ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়। যখন মানুষ কাম বা ক্রোধের বশীভূত হয়, তখন তাহার নিঃশ্বাস ক্ষুদ্র, দ্রুত ও অনিয়মিত হয়। ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম দ্বারা নিঃশ্বাস দীর্ঘ করিতে পারিলে রিপুর উত্তেজনা দমন করা যায়। প্রাণ বায়ুর দ্বারা পরিপাক, অপান বায়ুর দ্বারা মলমূত্রাদি ত্যাগ হয়। নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করিলে প্রাণাপানাদি বায়ু সক্রিয় ও সতেজ হয়। যৌগিক ব্যায়ামগুলি করিতে বিশ মিনিট সময় লাগে। তৎসঙ্গে পাঁচ মিনিট নিঃশ্বাসের ব্যায়াম ও পাঁচ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম মোট আধ ঘণ্টা আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ডাক্তার, অফিসার, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী প্রভৃতি যাহারা মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহারা প্রত্যহ আধ ঘণ্টা যৌগিক ব্যায়ামের জন্য দিলে, তাহাদের কর্মশক্তি ও রোগরাহিত্য বাড়িবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। যে সকল ছাত্র বা ছাত্রী লেখা-পড়ায় অমনোযোগী বা স্মৃতি-শক্তিহীন, তাহাদিগকে তিন মাস যৌগিক ব্যায়াম করাইয়া আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে।

নৌলী ও উড্ডীয়ান নামক দুইটি যৌগিক ব্যায়াম আছে। উহাতে তল-পেটের উত্তম ব্যায়াম হয়। পরিপাক-যন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রাশয়, মলভাণ্ডাদি কয়েকটি শরীরের নিম্নভাগে পাশাপাশি থাকে। উল্লিখিত ব্যায়ামদ্বয় দ্বারা এই সকল যন্ত্রের উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়। অন্ত্রটি প্রায় ২৫।৩০ ফুট লম্বা। উহার নিম্নাংশ মল-পূর্ণ থাকে। নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে অর্শ, ভগন্দর, ক্ষত, আমাশয় প্রভৃতি কঠিন রোগ হয়। আমেরিকার একটি হাসপাতালে কয়েক-জন ডাক্তার ২৮৬টি মৃতদেহ অস্ত্রোপচার করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে ২৫৬ জনের ক্ষুদ্রান্ত্র মলে পরিপূর্ণ এবং সেই জন্য তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সেই হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর বদ্ধ-পরিকর হওয়া কর্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধতা নাশে উড্ডীয়ান ও নৌলী অমোঘ। ছাত্রগণের ন্যায় ছাত্রীগণও

যৌগিক ব্যায়াম নির্ভয়ে করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা সমানভাবে উপকৃত হইবে। ছাত্র-ছাত্রীগণ মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া স্কুলে ও কলেজে এবং গৃহে বসে ও লেখাপড়া করে। বক্র উপবেশনে স্নায়ুমণ্ডলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পদ্মাসনে বসিয়া লেখাপড়া করিলে মেরুদণ্ড সবল থাকে এবং লেখাপড়ায় অধিক মন বসে। এই জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণকে পদ্মাসনে বসিতে শিক্ষাদান কর্তব্য।

নিয়মিত জীবন যাপন ও বীর্য্যধারণ ব্যতীত: শুধু ব্যায়াম দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ বা দেহমন গঠন বকাণ্ড প্রত্যাশামাত্র। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ, তৎপরে মলমূত্রত্যাগ ও দন্তধাবন, যথাসময়ে ব্যায়াম ও ক্রীড়া, নির্দিষ্ট কালে আহার, অধ্যয়ন ও শয়নাদি বিধেয়। আহার্য্য চর্বন, ও মাঝে মাঝে উপবাসাদি দেহ নীরোগ রাখিতে হইলে অত্যাবশ্যক। যে সকল ছাত্র হস্তমৈথুনাদি দোষে লিপ্ত, তাহাদিগকে গোরক্ষাসন ও হলাসনাদি করাইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। ছাত্র জীবনে যাহাতে বিদ্যার্থীগণ ব্যায়াম অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বীর্যধারণ করে, সেই দিকে ব্যায়াম শিক্ষকগণকে অধিক লক্ষ্য দিতে হইবে। আমরা যাহা আহার করি তাহার সারভাগ রসে পরিণত হয়। রস রক্তে, রক্ত মাংসে, মাংস মেদে, মেদ অস্থিতে, অস্থি মজ্জাতে এবং মজ্জা শুক্রে পরিণত হয়। শুক্র বা বীর্যই শরীরের সূক্ষ্মতম ও সারতম অংশ। ছাত্রছাত্রীগণ ইহা যতই ধারণ করিবে, ততই স্বাস্থ্যবান্ ও মেধাবী হইবে। বীর্য্যক্ষয় বন্ধ না করিয়া ব্যায়াম করিলে স্বাস্থ্য বা শক্তি লাভ হয় না। ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জল ঢালিলে উহা কখনও পূর্ণ হয় না।

বাংলার প্রত্যেক স্কুলে ও প্রত্যেক কলেজে যৌগিক ব্যায়াম প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বা ছাত্রীগণের নিকট যৌগিক ব্যায়ামের বিশেষত্ব ও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা এবং অভ্যাস কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য আমি এবং আমার ছাত্রগণ বিনা পারিশ্রমিকে যাইতে প্রস্তুত আছি। হরি ওম্।

যৌবন ও অপরাধ *

দুই

দণ্ডার্হ অপরাধের ভয়াবহ বৃদ্ধি সম্প্রতি দুনিয়ার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। গুগলফ নামক রাশিয়ান ডাক্তারের বোমার আঘাতে ফরাসী রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট পল ডুমারের হঠাৎ মৃত্যু ভুলিতে না ভুলিতেই রয়টার খবর আনিল যে, জ্যাঙ্গারা নামক ইতালীয়ের দ্বারা চিকাগোর মেয়র এ্যাণ্টন কারমাক হত হইয়াছেন। গুণ্ডাগণ কর্ত্তৃক অপহৃত লিণ্ডবার্গ শিশুর অপমৃত্যু মার্কিন জাতির একটা দুরপনেয় কলঙ্ক। লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ক্রীষ্টমাশ হামফ্রেজ (১) তাঁহার পুস্তকে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইংরাজ যুবকগণের দণ্ডার্হ অপরাধ কিরূপে অন্ধভাবে—তীব্রবেগে অতল নরকের দিকে ছুটিতেছে। সিংহলের ক্ষুদ্র দ্বীপে, গত বৎসর প্রায় ১০৫০০ দণ্ডজনক অপরাধ হইয়াছে—এইরূপ গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ। আমেরিকার এটর্ণি জর্জ্জ উইকারশ্যাম (২) বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও দণ্ডনীয় তরুণ অপরাধীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিতেছে যে, এইরূপ যুবক অপরাধীর অধিকতর কঠোর শাসন হওয়া উচিত। সেই হেতু সর্বদেশেই এইরূপ অপরাধের প্রতিকার করিবার জন্য ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টাও যথেষ্ট হইতেছে।

দণ্ডনীয় যুবাপরাধের ভীতিজনক বৃদ্ধি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র হইতেছে খবর কাগজের ক্রিমিন্যাল রিপোর্টগুলি পড়িলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এই ক্রমবর্দ্ধমান যুবাপরাধ বর্ত্তমান মানব সমাজের একটি কালিমা। সাধারণতঃ এইরূপ যুবকগণের বয়স ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে হয়। তাহারা

---

* অধুনালুপ্ত 'বিচিত্রা' মাসিকে ১৩৪০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অশিক্ষিত, শ্রমিক ও পতিত সমাজের লোক নহে—তাহাদের অধিকাংশই ভদ্রলোক ও সুশিক্ষিত। কোন জন্মজ দুর্বলতা হইতে যুবকগণ অপরাধী জীবন যাপন করিতে চায়—সেই প্রাচীন ধারণা আর বিশ্বাসযোগ্য নহে। নূতন অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ অপরাধী মনের ভাব অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

জেমস্ ডেভন্স্ (৬) বলেন যে, আইনমান্যকারী লোকদের মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় অপরাধীদেরমধ্যেওঠিক তেমনি প্রভেদ বিদ্যমান। আকৃতিতে তাহাদের মধ্যে ও সমাজের ভাল লোকদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করা, দোকান ভাঙ্গা, পকেট কাটা প্রভৃতি কার্য্যগুলি তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই করে। বাধা-বিপত্তির বিষয় সম্পূর্ণ জানিয়াই তাহারা এই পেশা গ্রহণ করে এবং এই সময় তাহারা এমন কর্ম্মতৎপরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কৌশল প্রদর্শন করে যে, মনে হয় তাহারা কোনও অভিজ্ঞ ফুটবল টীমের খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা ন্যূন নহে। যখন তাহারা ধৃত হয়, বা আদালতে বিচারাধীন হয় বা জেলে থাকে—তাহারা আদৌ লজ্জা বা অপমান বোধ করে না। শুধু যুবকগণ নহে, যুবতীগণও এই সকল ডাকাতিতে গোয়েন্দাগিরির কার্য্য করে। যুবকগণ কোন অভাববোধে যে সাধারণতঃ এইরূপ কুকর্ম্ম করে তাহা নহে—তাহাদের উৎসাহের উৎস হইতেছে ক্রীড়াশক্তি। যেমন লোকে কোন কর্ম্মকে জীবনের বৃত্তি বা পেশারূপে গ্রহণ করে ইহারা তেমনি চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে চায়। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্যার আর. এ্যাণ্ডারসন তাঁহার পুস্তকে (৭) একটী চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। গল্পটি এই—একবারলণ্ডনের কোন মন্ত্রীআমেরিকার একটি জেল দর্শন করিতে যান। তথায় তিনি একটি ভদ্র সন্তানকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার অবস্থা উন্নতির উদ্দেশ্যে আলাপ করিতে যাইলে যুবক অপরাধীই বাধা দিয়াবলেল,—আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ডে আপনারা শৃগাল-শিকারকে অতিশয় আমোদজনক ক্রীড়া মনে করেন। উক্ত মন্ত্রী সম্মতি

জ্ঞাপন করিলে যুবক বলিল, "আপনারা একবার অকৃতকার্য্য হইলেই কি এই শীকার ত্যাগ করেন ?" উক্ত মন্ত্রী-নীরব রহিলে যুবক পুনরায় বলিল—"ইহা খুব সত্য যে, আমি একবার অকৃতকার্য্য হইয়াছি; কিন্তু আমি পরের বারে কৃতকার্য্য হইবার খুব আশা রাখি।" ইহাই হইল তথাকথিত সুসভ্য সমাজের যুবকদের মানসিকঅবস্থা।

বর্ত্তমান যুবকগণের এই যথেচ্ছাচারিতার অনেক মুখ্য ও গৌণ কারণ আছে। অবশ্য চৌর্য্য-ভাব যাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে—যাহারা এই রূপে স্বভাবের বশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্ম করে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা যুবাপরাধের এক প্রধান কারণ। চিকাগোর ক্লিফোড আর শ এবং হেন্‌রি ডি. ম্যাক্‌ফে সাহেবদ্বয় বলেন যে, অপরাধীগণ যে গৃহে ও সমাজে জাত ও লালিত-পালিত সেই সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া শিশুকাল হইতেই তাহারা এই ভাব গ্রহণ করে। আমেরিকার বিখ্যাত সিং সিং জেলের ওয়ার্ডেন লিউয়িশ ই. লয়েশ (৫) সাহেব বলেন যে, শিশুকাল হইতেই যুবকগণ সাধারণতঃ ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে আইন অমান্যকারিতা ও অবাধ্যতা শিক্ষা করে। লণ্ডনের মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট আর. এই. ডুমেট্ বলেন যে, সাধারণ নগরবাসী বা গ্রামবাসীর লোভনীয় কার্যগুলি বিশেষভাবে দোষাবহ। তাহারা গৃহের বা দোকানের দ্রব্যসম্ভার এরূপ সাজাইয়া রাখেন যে, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত লোকের তাহা অপহরণ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়। আর এই দ্রব্যসম্ভার রাখিবার এমন ভঙ্গী যে, লোকে তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া কিনিতে চায় এবং অর্থাভাবে তাহা না পারিলে চুরি বা বাটপাড়ির দ্বারা পাইতে ইচ্ছা করে। গত ইউরোপীয় মহাসমরও উহার আর একটি কারণ। যুদ্ধ একটি জঘন্য, ঘৃণ্য পাশবৃত্তি বৃদ্ধিকর জাগতিক অনুষ্ঠান। যুদ্ধের পর মানব মনে অস্থিরতা ও বিদ্রোহভাব এমন বদ্ধমূল হয় যে, নানাভাবে তাহা প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহভাবের সংক্রামক ব্যাধি জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কমিউ-নিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম, অর্থমূলক শিক্ষা, চাকুরীহীনতা, আর্থিক দুরবস্থা, ব্যবসা

বাণিজ্যের অবনতি, যন্ত্র-সভ্যতা, অপরাধের গুণ গরিমাপূর্ণ পুস্তক বা ফিলম প্রভৃতি অসংখ্য কারণে বিশ্ব-সমাজের এই দুরবস্থা উপস্থিত। সর্ব্বোপরি সমাজের, রাষ্ট্রে, গৃহে ও স্কুলে, ঘরে ও বাহিরে কোথাও ধর্ম্মাদর্শ আর জীবিত নাই। লিউয়িশ্ ই লয়েশ (৩) সাহেব সিং সিং জেলের যাবৎজীবন অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, শতকরা ৯১ জন কয়েদী বাল্যকালে কোন নির্দ্দোষ ক্রীড়া শিক্ষা করে নাই, শতকরা ৭৫ জন কোন গৃহশিল্প বা কোন জীবিকা-বৃত্তি শিখে নাই এবং শতকরা ৯৯ জন ধর্মসংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল না এবং তাহাদের অধিকাংশের পূর্ব্বকৃত অপরাধের অভিজ্ঞতা আছে। এই অপরাধের মূল বিনাশ করিবার উপায় কি? হের্বার্ট বেগবি (৮) সাহেব বলেন যে, কমিউনিষ্টদের মনুষ্যজাতিকে একটি সৈন্যদলে পরিণত করিয়া এক নব জগৎ সৃষ্টি করিবার যেমন বৃথা প্রয়াস তেমনি দণ্ডনীয় দোষীদের সংখ্যা কমান অসম্ভব। সংস্কামূলক চেষ্টা অপেক্ষা প্রতিকারমূলক চেষ্টা অধিক আবশ্যক। অপরাধীকে সংশোধন করা অপেক্ষা অপরাধের মূলে কুঠারঘাত দরকার। সংস্কারও চাই; কিন্তু প্রতিকারের মূল্য বেশী। উদাহরণমূলক শাস্তির দ্বারা সমাজে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে। বেত দেওয়া, ফাঁসি দেওয়া, জেলে রাখা, সমাজ হইতে দূরে রাখা ও জরিমানা করা প্রভৃতি অবশ্যই চাই; তবে অপরাধের মূলোৎপাটিত করিবার জন্য প্রতিকার আবশ্যক। নাথেনিয়াল (৯) ক্যাণ্টর সাহেব বলেন যে, সংস্কার-মূলক শাস্তিরূপ মার্কিন প্রথা প্রচলনে বেশী লাভ হইবে। যত দিন না তাহাদের নৈতিক চরিত্রগঠন ও সংস্বভাব লাভ হয় ততদিন মাত্র অপরাধীদের জেলে রাখা উচিত। পাটনার বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিষ্টার (১০) প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় বলেন যে, 'ন্যায় মানুষ বিশেষের সম্মান করে না'—এই প্রবীণ ধারণা দ্রুত গতিতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে। অপরাধ অনুযায়ীই শাস্তিবিধান করা উচিত—ইহাই তাঁহার মত; কিন্তু ক্রীষ্মাস্ হামফ্রেজ প্রভৃতি অপরাধতত্ত্ববিৎগণ মানুষবিশেষে স্বল্পাপরাধেরও গুরুতর শাস্তির পক্ষপাতী। অনেক মনীষী অপরাধকে মনোব্যাধি বিশেষ মনে

করিয়া চিকিৎসা বিধান করিতে বলেন। কেহ কেহ আবার বলেন যে, অপরাধী মাত্রেই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ; তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, আইনকানুনের বর্মাবৃত বর্ত্তমান জগতে অপরাধ করিয়া ফাঁকি দেওয়া যায় না এবং এই প্রবৃত্তিতে জীবিকা অর্জ্জন ত দূরের কথা—তাহাদের জীবনও নিরাপদ নয়। ক্লেয়ারেন্স ড্যারে (১১) সাহেব বলেন যে, অপরাধীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন দোশ বা দুর্বলতার জন্যই তাহার এই দুর্ভাগ্য। তাই তাহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের প্রতি কঠোর না হইয়া কোমল ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। কঠোর শাস্তির দ্বারা অপরাধীর মন ও হৃদয় অপরিবর্ত্তনীয় রূপে কঠোর হইয়া যায়, তখন তাহাদের আর সংস্কার করা যায় না। তাই ইংলণ্ডে হাওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবগণ দণ্ডবিধি আইনের সংস্কার বিগত শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দণ্ডবিধান কিরূপে করা উচিত তাহা আইন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই বিচার্য্য। কারণ মিসেস লে মেজারিয়ার (১২) বলেন যে, অপরাধের পরিমাপ করিয়া তাহার উপযুক্ত ও ন্যায়মূলক দণ্ডবিধান খুবই শক্ত ; কারণ বিশেষজ্ঞগণ অপরাধ তত্ত্বকে বহু ভাবেই অধ্যয়ন করিয়াছেন।

সমাজ-শরীরের এই বিষ ও দূষিত রক্ত দূর করিবার জন্য সমষ্টিগত চেষ্টার প্রয়োজন। কেন মানুষ অপরাধ করে ও সৎপথে যায় না ! এই ক্ষণে অপরাধবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বটি দর্শনের আলোকে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। অপরাধ তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, অপরাধীদের মধ্যে পাপাসক্তি বা অপরাধাসক্তি অপেক্ষা দায়িত্ব বোধের অভাবই বেশী ক্রিয়াশীল। সুতরাং নীতি ও দায়িত্ব বোধের জ্ঞানটি সমাজের মনে বিশেষরূপে জাগ্রত করা উচিত। এই লজ্জাকর অবস্থার জন্য পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষার ত্রুটীগুলি বিশেষভাবে নিন্দনীয়। ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদের আলোকে অপরাধতত্ত্ব আরও গভীরভাবে বোঝা যাইতে পারে। কয়েদীরা ত মানুষ, তাহাদের পূর্ব জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কী রূপে তাহাদের বোঝা সম্ভব। কুলক্রমাগত ও

বংশপরম্পরা প্রাপ্ত গুণ (heredity) যখন অপরাধ সমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতে পারে না তখন একটি দার্শনিক সমালোচনা ও সমাধান অত্যাবশ্যক—কেন অপরাধীর আত্মা অপরাধ হইতে বিরত হয় না। যদি পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে অপরাধ বিজ্ঞান পুনর্নির্মিত হয়—তবেই উহা পূর্ণ হইতে পারে। এইচ. পি. ব্লাভাট্স্কি (৪) সাহেব বলেন যে, নীতিহীনতা ও অপরাধের উর্ব্বর ভূমি হইতেছে—এই বিশ্বাস যে মানুষ স্বকৃত অসৎ কর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ছেলে বেলা হইতে তাহাদের ইহা মর্মগত হওয়া উচিত যে, মানুষকে সৎকর্মের ন্যায় অসৎ কর্মের ফল শুধু এক জন্মে নয়, জন্মজন্মান্তরেও ভোগ করিতে হইবে; কর্মফল কেহই এড়াইতে পারে না। এমন কি ঈশ্বরের করুণাও এইরূপ স্থানে কোন কিছু করিতে পারে না। কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদের ভিত্তিতে দণ্ডাই অপরাধীর প্রকৃত সংস্কার সম্ভব, অন্যথা নহে।

মানবাত্মা এত পাপাসক্ত হইতে পারে না যে, তাহার সংশোধন অসম্ভব। মানবাত্মা অব্যক্ত ব্রহ্ম। এই ভাব তরুণ হৃদয়ে সুদৃঢ় করিতে হইবে।

মানুষ এত পাপ ও কুকর্ম করিতে পারে না যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত দৈব স্ফুলিঙ্গ নষ্ট হইতে পারে। তুলার পাহাড় কখনও অগ্নিকণাকে চিরতরে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কিয়ৎ কালের জন্য অস্থায়ীভাবে মানবাত্মার ব্রহ্ম-শক্তি পূর্বকৃত অপরাধের চাপে ঢাকা থাকে—এই সুপ্ত শিক্ষা জাগ্রত করিবার জন্য অস্তিগর্ভ ও ভাবাত্মক (positive) প্রচেষ্টা দরকার। সব শিক্ষা ও সংস্কারের মূল এই প্রত্যক্ষ, অবক্র, অস্তিগর্ভ উপায়—সর্ব প্রকার নিষেধার্থক, নাস্তিগর্ভ উপায় ত্যাগ করা উচিত। মানব চরিত্রের মহাগৌরব অপরাধীদের ও শিশুদের শিক্ষা দেওয়াউচিত। লোমব্রোসো হইতে বর্ত্তমান কালাবধি অপরাধ তত্ত্ববিজ্ঞান বলিতেছে যে, অপরাধীদের কোনও সচিহ্ন দল বা জাতি নাই। সমাজের মধ্যে একদল ব্যক্তি এইরূপ সর্বদা আছে—এই সংকীর্ণ ভিক্টোরিয়া যুগের ধারণা আমূল মিথ্যা। মানুষের দেব-চরিত্র কদাপিও

চিরতরে নষ্ট হইতে পারে না। এই ভুল ধারণা আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পওহারীবাবার ঘটনাটি দ্বারা উহা বিশদ হইবে। একদা রাত্রিকালে পওহারীবাবার আশ্রমে একটি চোর ঢুকে। পাছে সাধু জাগিয়া উঠে, চোরটি এই ভয়ে তাড়াতাড়ি জিনিষগুলি গুছাইতে গিয়া কি একটা শব্দ করিয়া ফেলে। সাধু অজ্ঞাতসারে পাশ ফিরিতেই কোনও একটু শব্দ হয়। সাধুটির ভয়ে শব্দ শুনিয়া সামান্য জিনিষপত্র লইয়াই চোর পলাইয়া যায়। সাধু সবই জানিতেন। চোরটিকে পলাইতে দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তিনি উঠিয়া সমস্ত জিনিষ পত্রগুলি বাঁধিয়া মাথায় করিয়া ছুটিলেন ও চোরটিকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে ধরিলেন। চোরটি ভয়ে কাঁপিতেছে ও কাঁদিতেছে। চোরটি সাধুর মতলব না বুঝিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনেক কাকুতি মিনতি করিল। তখন সাধু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুমি ভয় পাইও না। আমি তোমাকে ধরিতে আসি নাই। তোমার অভাব অনেক, সংসারে স্ত্রী-পুত্র অনাহারে আছে, আমার ত কোন অভাব নাই, তুমি সব জিনিষ আনিতে পার নাই বলিয়া এই সব তোমাকে দিতে আসিয়াছি। তুমি এইগুলি লইয়া বাড়ী যাও।" চোরটি জীবনে কখনও এইরূপ সহৃদয় ব্যবহার পায় নাই। আশাতীত ভাবে এই সদ্ব্যবহার পাইয়া তাহার জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। সেই দিন হইতে চৌর্যবৃত্তি ছাড়িয়া সে সাধু জীবনযাপন করিতে লাগিল। বুদ্ধদেবের স্পর্শে অঙ্গুলিমালা নামক ডাকাতের জীবনও এইরূপে পরিবর্তিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জীবনের স্পর্শেও অনেক পাপী সাধু হইয়া গিয়াছে।

যতদিন না পাশ্চাত্যের তরুণ সভ্যতা প্রাচ্যের এই দুইটী 'বাদ' গ্রহণ করে ততদিন হেরিডিটির মতবাদ ও ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভবপর হইবে না। হেরিডিটি ও পুনর্জন্মবাদ উভয়েই মিলিত হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটি ঐক্য পাওয়া যাইবে। অবশ্য প্রাচীন প্রাচ্যের এই মতবাদ নবীন পাশ্চাত্য ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছে। এই কর্মবাদের উপর সমগ্র বিজ্ঞানের রাজপ্রাসাদ

নির্মিত। জিশুখ্রীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন—যিনি যাহা বপন করিবেন তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্বকৃত কর্মানুযায়ী আমরা ভবিষ্যৎ জীবন পাইব। হেরিডিটি শরীরক্ষেত্রে বা স্থূলরাজ্যে প্রযোজ্য; কিন্তু মনোজগৎ বা আধ্যাত্মিক রাজ্যে উহার ক্ষমতা বেশী নাই—তথায় কর্মবাদের লীলাভূমি বিদ্যমান। মহম্মদ ছিলেন মেষপালক, কৃষ্ণ গোপালক, ও ঈশা ছিলেন কার্পেণ্টার। হেরিডিটির দ্বারা ত আর এই সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কাজেই কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ আনিতে হয়। সুতরাং দণ্ডবিধি ও অপরাধ বিজ্ঞান উক্ত মতদ্বয়ের আলোকে অধ্যয়ন করা উচিত।

যৌবনে উদ্যম ও শক্তির জোয়ার যখন আসে তখন তাহাকে একটি সৎপথে চালিত করিতে হইবে। 'কুড়ের মাথা শয়তানের কারখানা'—এই কথা অক্ষরে অক্ষরে অতি সত্য। প্রথমতঃ যুবকের অভাবগুলি—অন্ততঃ সাদাসিদে খাওয়া পরার অভাবটী দূর করিতে হইবে। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও নানা প্রকার ক্রীড়ার দ্বারা তারুণ্য শক্তির একটী পথ করিয়া দিতে হইবে। পাহাড়ে চড়াই, সমুদ্রে-ডোবা বা আকাশে উড়া প্রভৃতি বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের অসমসাহসিক খেলাগুলি অতি উত্তম। নচেৎ তরুণ শক্তি কুমতলবে নিয়োজিত হইবে। সঙ্গীত, শিল্প, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বা কোন সমাজসেবার কার্য্য দ্বারা শক্তির ক্রীড়াভুমি শরীর হইতে মনে আনিতে হইবে। শক্তি চায় প্রকাশ ও সৃজন। কাজেই যুবকগণের মনোযোগ কোন সৎকার্য্যে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই শ্রেয়স্কর। যখন মন জড়ভূমি ছাড়িয়া চিন্তারাজ্যে উঠে তখন মানুষ অপরাধ আর করিতে পারে না। ব্যক্তিগত উদাহরণ দ্বারা তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যেই শক্তির পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব। সুতরাং শক্তি বাহিরে বৃথা ব্যয় না করিয়া সংযত করা উচিত।

জুভেনাইল জেল বা জুভেনাইল কোর্টের অবশ্য প্রয়োজন আছে; কিন্তু অপরাধের বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত ইহা দ্বারা হইবে না। তাই প্রত্যেক সমাজে সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক। প্রথমতঃ দরকার গৃহস্থ জীবন বা পারিবারিক আদর্শ

গুলি উন্নত করা। পিতামাতাকে শিশুর সমস্ত ভার লইতে হইবে; ধাত্রীর উপর সব ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, শিশু নয় বৎসর বয়সেই সব শিক্ষা শেষ করে। আজকালকার শিশু ৯।১০ অবধি দিনে অল্প কয় ঘণ্টা মাতৃ-ক্রোড়ে থাকে। বিবাহিত জীবনের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। আজকাল 'বার্ট্রাণ্ড রাসেলের' বিবাহই আমাদের সামাজিক আদর্শ। গৃহকে একটী মন্দির ও বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। মূল কথা—বিবাহিত জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন। আধুনিক গৃহ যেন এখন একটা ক্লাবে বা ক্যাম্পে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনদের নিকট শাস্ত্রপাঠ, উপাসনা ও ধর্মজীবন একটা জীবনের দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল, অধুনা নবীনদের তাহা আদৌ নাই। শিশুদের ছেলেবেলা হইতেই মনঃসংযম ও ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া উচিত। মনস্তত্ত্ববিৎগণ বলেন যে, লোকের ভ্রম সংশোধনার্থ দোষ প্রদর্শন করিলেও কেহ তাহা পছন্দ করে না। তাই লোকে মনঃসংযম অভ্যাস করিলে আপনার ভুল আপনিই বুঝিতে পারিবে। ইহাই সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিক্ষাতত্ত্ববিৎগণ আরও বলেন যে, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিশুকে রাখ—তাহার শিক্ষা আপনিই হইবে। মণ্টেসারি শিক্ষার ইহাই সার কথা। আর গৃহেই আমাদের তদ্রূপ শিক্ষাক্ষেত্র তৈয়ার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়। বর্ত্তমানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিই নাস্তিক ও ধর্মহীন। শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আজকাল আর নাই। বর্ত্তমানের শিক্ষা কেবল অর্থাগমের উপায় মাত্র। আর শিক্ষকদের চরিত্রহীনতার সীমা নাই; তাহারা আবার শিখাইবে কি? শিক্ষকগণ শিশুদের দ্বিতীয় পিতা-মাতা; আর বিদ্যালয় শিশুদের দ্বিতীয় গৃহ। শিক্ষকের এই মহাদায়িত্ব তাহারা যেন ভুলিয়া না যান! শিশুদের মনে সৎভাব ও সৎআদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের জীবনকে উচ্চাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। শিক্ষকগণ ত ভাবী সমাজের স্রষ্টা। শিক্ষকগণ যেমন আদর্শ দেখাইবেন শিশুরা তাহাই দেখিয়া শিখিবে, বলিবারও তত আবশ্যক নাই। তৃতীয় ধর্ম্মস্থান

মন্দিরগুলি ও ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রায় লোপ পাইয়াছে। সমাজে যত চরিত্রবান মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতি থাকে সমাজ অজ্ঞাতসারে ততই উন্নত হয়। প্লেটো বলেন যে, সমাজ ও শহর হইতে অসৎ দূর করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞানী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ধর্ম্মও আজ ব্যবসাদারীতে পরিণত! হায় কি দুর্ভাগ্য আমাদের! সমাজের যাঁহারা ধর্ম্মগুরু তাহাদের জীবন আরও উন্নত হওয়া চাই; তাঁহাদের ব্রহ্মানুভূতি চাই—কথায় আর কত দিন চিঁড়া ভেজে? মহৎ লোক ত দূরের কথা, সমাজে আজকাল একটা সৎ লোকও পাওয়া কষ্টকর। গৃহ, বিদ্যালয় ও মন্দির এই তিনটীর আমূল সংস্কার করিলে অপরাধের বংশনাশ হইতে পারে। সমাজের ও দেশের নেতাগণের সাগ্রহ দৃষ্টি এই সমস্যাটীতে বিনীতভাবে আকৃষ্ট করিতেছি।

(1) "The Menace in our Midst" by Christmas Humphreys.

(2) "Report of the National Com. on Law observance and Enforcement." 1931 by the Chairman, George Wickersham.

(3) "Twenty Thousand Years in Sing Sing"' by Lewis E. Lawes.

(4) "Key to Theosophy" by H. P. Blavatsky.

(5) "Life and Death in Sing Sing" by Lewis E. Lawes.

(6) "The Criminal and the Community" by J. Devons,

(7) "Crime and Criminals' bp Sir R, Andersan,

(8) "Punishment and Personality" by H, Begbie,

(9) "Crimes, Criminals and Criminal Justice" by N Cantor,

(10) "From Punishment to Crime" By P, K, Sen.

(11) "Crime—its Cause and Treatment" by C, Darrow,

(12) "Boys in Trouble' Mrs, Le Mesurier,

তিন

বৌদ্ধধর্মে প্রাণায়াম

প্রাণায়াম বৌদ্ধধর্মে ও ইসলামে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহাকে বৌদ্ধ ধর্মে আনাপান সতী ও ইসলামে সুলুক বলা হয়। দক্ষিণদেশীয় বা হীনযান বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পদ্ধতিতে প্রাণায়াম কি ভাবে প্রচলিত আছে তাহাই সংক্ষেপে এই পরিশিষ্টে আলোচ্য। প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ 'বিশুদ্ধি মাগ্‌গে'র অষ্টম অধ্যায়ে উহা বিবৃত। কলম্বো সহরের ডাঃ ক্যাসিয়াস পেরেরা প্রণীত Anapana Sati এবং Meditation Based on Mindfulness with regard to Breathing এবং নিউইয়র্কের ক্লড ব্রাগ্‌ডন প্রণীত Introduction to yoga প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় বিখ্যাত। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেও হিন্দু যোগ প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের দুই আদি গুরু আলার ও উদ্দক যোগী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষু রাহুল সংকৃত্যায়ন বলেন, "পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত যোগ প্রণালী-বদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হয় নাই। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধ ধর্মের অধীনে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল।" পাতঞ্জল যোগসূত্রের টীকাকার বিজ্ঞান ভিক্ষুর 'যোগবার্তিক' পড়িলে এই মন্তব্য সমীচীন মনে হয় না।

অশুদ্ধ বায়ু শরীরে থাকিলে মন একাগ্র হয় না। দেহস্থ অশুদ্ধ বায়ুকে বহিস্কৃত করার জন্য নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। অশুদ্ধ বায়ু দেহে থাকিলে নিশ্বাস অনিয়মিত ও মন বিক্ষিপ্ত হয়। সেইজন্য ধ্যানের পূর্বে প্রাণায়াম অভ্যাস প্রয়োজনীয়। শ্বাস-যন্ত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য নিম্নোক্ত যৌগিক নিশ্বাস অভ্যাস করিতে হয়। তর্জনী দ্বারা অল্প চাপ দিয়া ডান নাক বন্ধ কর এবং এক সঙ্গে বাম নাক দিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস লও। পরে কয়েক সেকেণ্ড গৃহীত বায়ু ভিতরে রাখিয়া ডান নাক দিয়া বায়ু ত্যাগ কর। অনন্তর বাম নাক এক অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ডান নাক দিয়া শ্বাস লও এবং কিছুক্ষণ বায়ু ধারণান্তে বাম নাক দিয়া বায়ু ত্যাগ কর। এইরূপে ১০।১৫ বার করিলে

নাড়ী শুদ্ধ হইবে; দেহস্থ দূষিত বায়ু বাহিরে যাইবে। উল্লিখিত ক্লড ব্রাগ্‌ডেন বলেন, "যোগাসনে বসিয়া ধ্যানারম্ভের পূর্বে চার সেকেণ্ড নিঃশ্বাস গ্রহণ, ষোল সেকেণ্ড বায়ুধারণ এবং আট সেকেণ্ড বায়ুত্যাগ কর্তব্য। এইরূপে দশবার করিলে নিঃশ্বাস নিয়মিত হইবে।" কিন্তু ষোল সেকেণ্ড বায়ুধারণ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে। তজ্জন্য কুমারী লাউন্সবেরী বলেন, "১, ২, ৩ করিয়া ৮ গুণিতে যত সময় লাগে তত সময় বায়ু লও। ৪ গুণিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ বায়ুধারণ কর। এই সময় বায়ু গ্রহণ বা ত্যাগ বন্ধ থাকিবে। অনন্তর আট গুণিতে যত সময় লাগে তত সময়ে গৃহীত বায়ুত্যাগ কর।" এইরূপে ১০।১৫।২০ বার পুনঃ পুনঃ করিলেই নাড়ীশুদ্ধি হইবে। নিঃশ্বাস যতই নিয়মিত হয় ততই দেহ-যন্ত্র সুস্থ ও নীরোগ থাকে।

উক্তরূপে তালে তালে নিশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ বিশ্রাম কালে বা বেড়াইবার সময়েও করা যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুসারে নিশ্বাস-গণনা চলিবে। ইহার অর্থ, হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন অপেক্ষা নিঃশ্বাস দ্রুততর বা মৃদুতর হইবে না, সমান হইবে। ধীরে ধীরে ও নিয়মিত ভাবে ৮ গুণিতে যত সময় লাগে তত সময়ে ফুসফুসের সমস্ত বায়ু ত্যাগ কর। তিন গুণিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ বায়ু গ্রহণ করিও না। তৎপরে ৬ গণনার সময়ে ফুসফুস ধীরে ধীরে বায়ুপূর্ণ কর। ৩ গণনার সময়ে বায়ু ভিতরে আবদ্ধ রাখ। এই রূপে দশ বার অভ্যাস কর। ইহাই তৃতীয় ব্যায়াম। কিছুকাল অভ্যাস করিবার পর সংখ্যা-গণনা বাড়ান যাইতে পারে। বায়ুধারণ আরামদায়ক হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা বায়ুগ্রহণ বা বায়ুবর্জনের অর্দ্ধেক হইবে। সামর্থ্যাধিক বায়ুধারণ করিলে মাথা ঘুরে ও অস্বস্তি বোধ আসে। প্রাণায়ামে বায়ু নিরোধ কদাপি ক্লান্তিকর হইবে না। নিঃশ্বাস ব্যায়ামে স্নায়ুমণ্ডলী সুস্থ, মন শান্ত ও দেহ শুদ্ধ হয়। কাহারো কাহারো মতে যোগী বায়ুত্যাগ কালে উহার উপর মনোযোগ দিলে ও বায়ু-গতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে মন স্থির হয়। মনোযোগ আকর্ষণই সংখ্যা-গণনার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন বৌদ্ধ

ভিক্ষু বা জেন যোগী বলেন, "স্থির মনে দশ দশ করিয়া এক শত পর্য্যন্ত গণনা অভ্যাস করিলেই একাগ্রতা লাভ হয়। একাগ্র চিত্তে তিনশত গুণিতে পারিলেই মন স্থির হয়। সংখ্যা-গণনার সময় মন চিন্তামুক্ত থাকিবে।" উহা দুষ্কর বলিয়া হিন্দু যোগিগণ ওঁ বা রাম বা কৃষ্ণ বা কালী বা .শিব নাম জপের বিধান দেন। জাপানের কোন জেন মঠের অধ্যক্ষ ডাক্তার কারবী বলেন, "গভীর ভাবে আগ্রহান্বিত হওয়াই সর্বাপেক্ষা সরল উপায়। তীব্র আগ্রহ থাকিলে গণনা যান্ত্রিক (mechanical) বা ক্লান্তিকর হয় না। তৎপরেই ধ্যেয় বিষয় চিন্তনীয়। আগ্রহ আন্তরিক হইলে মানস প্রতিরোধ ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে। অভ্যাসকারী যতই একনিষ্ঠ হউন না কেন প্রাথমিক অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী। কিছুকাল অভ্যাসের ফলে এই সকল অসুবিধা অন্তর্হিত হয়। ধ্যানকালে অদ্ভুত চিন্তাসমূহ মনে উদিত হয়। উহাতে বিচলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন বা অনিষ্টকর। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও সুদৃঢ় সংকল্প দ্বারা কাম্য ফল লাভ হয়। কখনও কখনও আশাতীত ভাবে অত্যল্প সময়ে উক্ত ফল করায়ত্ত হয়।"

শ্বাসগতির উপর মনোযোগ দানই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত। ডাঃ ক্যাসিয়াস পেরেরা প্রণীত 'আনাপান সতী' নামক ইংরাজী পুস্তকে আছে, "বহু শতাব্দী ধরিয়া যে নিশ্বাস বিজ্ঞান বৌদ্ধ ধর্মে প্রচলিত তাহা প্রথমে উত্তমরূপে অবগত হওয়া দরকার। তখন সাধক স্বীয় দেহ-মনের সামর্থ্য অনুযায়ী সংখ্যা-গণনাদি স্থির করিতে পারিবেন। অন্যথা অভিজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন।"

থেরাবাদ বৌদ্ধ ধর্মে যে চল্লিশ প্রকার ধ্যেয় বস্তু নির্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে শ্বাস বায়ু অন্যতম। আনাপান সতীতে আট স্তর আছে। প্রথম স্তরে গৃহীত ও বর্জিত বায়ুর গণনা চলে দ্বিতীয় স্তরে অনুবন্ধনা। ইহাতে চিন্তাস্রোত বায়ুর অনুগামী হয়। তৃতীয় স্তরে নাসারন্ধ্র বা ওষ্ঠদ্বয়ের সহিত বায়ুর সংস্পর্শ অনুভূত হয়। চতুর্থ স্তরে বায়ুরগতি নিরীক্ষণ। ইহাতে শ্বাস বহিতেছে, এই বোধ

থাকিবে ; কিন্তু উহার প্রতি অধিক মনোযোগ থাকিবে না। পঞ্চম স্তরে শ্বাসের অনিত্যতা বোধ। গর্ভস্থ শিশু, মূর্চ্ছিত মানুষ ও মৃত ব্যক্তি এবং সমাধিস্থ যোগীর শ্বাস চলে না। ষষ্ঠ স্তরে মার্গধ্যান। সপ্তম স্তরে ফলধ্যান এবং অষ্টম স্তরে উল্লিখিত সপ্ত স্তরের ভাবনা করিতে হয়। মস্তক উন্নত ও মেরুদণ্ড অবক্র না থাকিলে শ্বাসগতি স্বাভাবিক হয় না। আনাপান সতীতে গৃহ্যমান ও বহির্গম্যমান বায়ুর উপর মনসংযোগই মুখ্য অঙ্গ। ইহাতে বায়ুত্যাগের পরে বায়ুগ্রহণ সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়। গণনা-স্তরে লক্ষ্য করিতে হইবে দীর্ঘ বা হ্রস্ব বায়ুর পরিবর্ত্তন। ক্রমশঃ শ্বাস দ্রুত, ক্ষীণ ও বন্ধ হয়। প্রথম শিক্ষার্থী পাঁচের কম বা দশের অধিক গণনা করিবে না। যোগাচার বৌদ্ধগণ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা মনোনীত করিয়া সমগ্র অভ্যাসে উক্ত সংখ্যা রক্ষা করেন। প্রথমতঃ শ্বাসের শেষে গণনা হইবে। ইহার অর্থ, শ্বাস গ্রহণ শেষ হইলে এক গণনা কর এবং শ্বাসত্যাগ সমাপ্ত হইলে দুই গণনা কর। অভ্যাস অগ্রসর হইলে নিশ্বাস্ বা প্রশ্বাসের প্রারম্ভেই গণনা করা যায়। যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ গণনা চলিবে। ইহার অর্থ, মন যতক্ষণ শ্বাস-চিন্তায় পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ গণনা প্রয়োজন। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কুমারী লাউন্সবেরী প্যারিস নগরীতে তাঁহার প্রাণায়াম শিক্ষার্থীগণকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন। প্রথমে একটি দীর্ঘ শ্বাস লও। পরে ১, ২, ৩, ৪, ৫, গুণিয়া নিশ্বাস গ্রহণ কর অনন্তর ১, ২, ৩, ৪, ৫ গুনিয়া নিশ্বাস ত্যাগ কর। একবার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনকে একটি পূর্ণ শ্বাস বলা চলে। প্রত্যেক পূর্ণ শ্বাসের শেষে এক দাগ দাও। এইরূপে দশবার পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম অভ্যাস কর। প্রত্যেক দশবার পূর্ণ শ্বাসের শেষে একটি ক্ষুদ্র শ্বাস লও।

গণনা বন্ধ হইলেই দ্বিতীয় স্তর উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে ঘ্রাণ-দ্বারের মধ্যে শ্বাস-গতি নিরীক্ষণ করিতে হয়। তখন অনুভব করা যায় যে, ঘ্রাণ-দ্বার হইতে শ্বাস বক্ষঃস্থল দিয়া নাভি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিলে বোঝা যায়, শ্বাস নাসারন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত যাতায়াত

করে; কিন্তু বৌদ্ধ যোগে ঘ্রাণদ্বার ও নাভিদেশই শ্বাস-মার্গের দুই সীমারূপে নির্দিষ্ট। কোন্ ক্ষণে শ্বাস ঘ্রাণ-দ্বারে প্রবেশ বা ত্যাগ করে তাহা তৃতীয় স্তরে লক্ষ্য করিতে হয়। ইহাতে শ্বাস-গতির ঘ্রাণদ্বারে প্রবেশ ও উহা হইতে নির্গমন মুহূর্তে মনোযোগী হইতে হয়। আনাপন সতীতে ধ্যেয় শ্বাস ক্রমশঃ স্পষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহাতে শ্বাস সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম হয়। শেষে যোগী শ্বাসগতি সম্বন্ধে আদৌ অবহিত থাকেন না। তখন শ্বাসগ্রহণ, শ্বাসত্যাগ ও ঘ্রাণদ্বার—এই তিনের চিন্তামাত্র মনে থাকে। মন আরো একাগ্রে হইলে উক্ত তিন চিন্তা একত্রিত হয়, কেবল শ্বাসচিন্তা থাকে। যখন মন সমাহিত হয় তখন শ্বাসগতি বা ঘ্রাণদ্বয়ের চিন্তা মন ভুলিয়া যায়। তৃতীয় স্তরে বস্তুতঃ শ্বাসরোধ হয় না; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়বৃন্দ এত সূক্ষ্ম নয় যে, সূক্ষ্মতম শ্বাসগতি অনুভব করিতে পারে।

চতুর্থ স্তরে বাহ্যতঃ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অভ্যাসকারীর মনে একটি শ্বাস-রূপ ভাসিয়া উঠে। তখন তিনি উক্ত রূপের উপর সমস্ত মন একাগ্র করেন। কেহ দেখেন, উহা মাকড়সার জালের মত. কেহ দেখেন, উহা সাবান-ফেনার বুদবুদের মত; কেহ দেখেন, উহা কুয়াসার মত ইত্যাদি। এই সূক্ষ্মতম শ্বাসরূপ বিশ্বব্যাপী হয়। পরিশেষে সাধক সপ্ত স্তরের সপ্ত চিন্তা এই ভাবে ধ্যান করেন। আমি শ্বাস লই বা ছাড়ি আমাতে শ্বাস আছে। আমি শ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু নহি। শ্বাসক্রিয়া বিদ্যমান। সর্বত্র শ্বাস অবস্থিত। শ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সবই শ্বাস বা প্রাণ। অথবা সপ্তম হইতে প্রথম চিন্তায় ফিরিয়া আসাও চলে। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, বৌদ্ধ জগতে প্রাণায়াম কিরূপ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালে অনেক জার্মান ভিক্ষুর সহিত আলাপে বুঝিয়াছি, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। সুবিশাল মহাভরতে ও বহু বৌদ্ধ দেশে প্রাণায়াম জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সমাপ্ত